প্রযুক্তিবিদ্যা

নভেম্বর - ২০২১

শিক্ষা:

* দেড় বছর পর সশরীরে ক্লাস-পরীক্ষা
* বাল্যবিবাহ হওয়া শিক্ষার্থীরা ফের ক্লাসে
* ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম পঞ্চগড়ের সাকিব

ব্যাবসা করতে টাকা লাগেনা

আরো আছে:

- কবিতা
- গল্প
- কমিক
- কুইজ

ইতিহাস

* মুহাম্মদ আল ফাতেহ
* শের-ই-বাংলা ফজলুল হক

প্রযুক্তি

* আইফোনের কাপড়-১৯ ডলার
* ক্রিকেট স্টাম্পে ক্যামেরা
* ফেসবুকের নাম পরিবর্তন
* ৬০০ কোটি ডলারের লোকসান
* বিমানের জানালায় ছিদ্র থাকে কেন?

শীতের জীবনযাত্রা

কিছু কথা...

TechEdu360 থেকে প্রকাশিত মাসিক ই-ম্যাগাজিন **"প্রযুক্তিবিদ্যা"** মূলত Owlpro কোম্পানির একটি প্রকল্প যার সম্পুর্ন ব্যবস্থাপনায় Owlspro টিম নিয়জিত।

যখন কেউ কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানার অথবা বুঝার চেষ্টা করে তখন তাকে তারিখ এবং স্থান এত বেশি শুনতে হয় যে পরবর্তীতে সে উক্ত ঘটনা বা ইতিহাসটি জানার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। মূলত TechEdu360 টিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সহজভাবে প্রদর্শন করা, যাতে বাংলাভাষী মানুষের কাছে যেকোনো তথ্য জানার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি হয়।

যদি আপনি একজন ভাল লেখক হোন অথবা ইতিহাসবিদ বা ভাষাবিদ হোন তাহলে আপনার লেখা অন্তত একটি পান্ডুলিপি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইলে। (projuktibidda@techedu360.com). আমরা অবশ্যই আপনার পান্ডুলিপি আমাদের মাসিক ই-ম্যাগাজিন **"প্রযুক্তিবিদ্যা"** তুলে ধরার সম্পুর্ন চেষ্টা করবো।

"প্রযুক্তিবিদ্যা" হলো প্রযুক্তি ও শিক্ষা ভিত্তিক একটি ই-ম্যাগাজিন। ডিজিটাল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও হয়ে উঠেছি ডিজিটাল আর তাই ম্যাগাজিনকে নিয়ে এসেছি আপনার পকেটের মধ্যে।

আমাদের এই ই-ম্যাগাজিনটি আপনি যত ইচ্ছা ততবার ডাউনলোড করতে পারবেন এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে পড়তে পারবেন, তাছাড়া আমাদের ম্যাগাজিনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

Powered by:

Owlspro START WITH TRENDS | TechEdu360

এইবারের সংখ্যায় যা যা থাকছে.....

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান

- ফেসবুকের নাম পরিবর্তন..... ০১
- বিমানের জানালায় অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে কেন?..... ০৩
- মহাকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে নাসার নভোযান..... ০৪
- আইফোন মোছার কাপড় বিক্রি করছে অ্যাপল..... ০৬
- ক্রিকেটে স্টাম্প ক্যামেরা কাজ করে কীভাবে?..... ০৮
- কয়েক ঘণ্টায় ৬০০ কোটি ডলার ক্ষতি..... ১০
- চীনে বন্ধ হচ্ছে মাইক্রোসফটের লিঙ্কডইন..... ১২

ব্যবসা-বাণিজ্য

- ব্যবসা করতে টাকা লাগে না, বুদ্ধি লাগে..... ১৪
- পুরোনো জাহাজে হাজার পণ্যের ব্যবসা..... ১৭
- ই-কমার্স সংকট সমাধানে এখনো যে সুযোগ রয়েছে..... ২২

Owlspro এর প্রথম বর্ষ উদযাপন..... ২৮

শিক্ষা

- বাল্যবিবাহ হওয়া শিক্ষার্থীদেরও ক্লাসে ফেরানোর চেষ্টা..... ৩০
- ঢাবিতে দেড় বছর পর সশরীরে ক্লাস-পরীক্ষা..... ৩২
- ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হলেন পঞ্চগড়ের সাকিব..... ৩৪
- এ বছরও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হচ্ছে না..... ৩৬

কমিক..... ৩৮-৪৯

জীবনযাত্রা ও সাময়িক

- শীতের সেই নব সকাল..... ৫০
- বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা..... ৫২
- শীতের গ্রাম বাংলা..... ৫৭

ইতিহাস

- শের-ই বাংলা এ কে ফজলুল হক..... ৫৮
- কনস্টানটিনোপল বিজয়ী মুহাম্মদ আল ফাতেহ..... ৬২

ছোট গল্প

- পঞ্চায়েতের বিচার নিয়ম..... ৬৫

কবিতা

- "পউষ (কাজী নজরুল ইসলাম)..... ৬৮

জন্মদিন..... ৬৯

শেষ পৃষ্ঠায় থাকছে বিশেষ চমক!!!

ফেসবুকের নাম পরিবর্তন

ফেসবুকের নামে পরিবর্তন আসবে, এমন খবর ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। অনেকেই সম্ভাব্য নাম প্রস্তাব করেছেন। সেই প্রস্তাবনার বেশির ভাগই তাঁরা করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্ম টুইটারে গিয়ে।

কেউ কেউ বলেছেন নাম সংক্ষেপ করে 'এফবি' করা হোক। অনেকেই এ নামে ফেসবুকের উল্লেখ করে থাকেন। আবার ফেসবুকের প্রথম নাম 'দ্য ফেসবুক' করার দাবিও এসেছে। নাম পরিবর্তনের পরিকল্পনার খবর প্রথম প্রকাশ করে দ্য ভার্জ। ওয়েবসাইটটির আরেক প্রতিবেদনে সম্ভাব্য নাম হিসেবে 'হরাইজন'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বেশ আগে থেকেই এ নামে একটি ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে কাজ করছে ফেসবুক। মেটাভার্সের ধারণার সঙ্গেও যা মিলে যায়। মেটাভার্সে ফেসবুকের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সেবা পাওয়া

যাবে ভার্চ্যুয়াল জগতে, যে জগতে ব্যবহারকারীরা যুক্ত হয়ে বাস্তব দুনিয়ার মতো একে অপরের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে পারবেন, একসঙ্গে কিছু কিছু কাজও হয়তো করতে পারবেন। ভার্চ্যুয়াল আর বাস্তব জগতের বিভেদ কমে যাবে বলা হচ্ছে, যা অর্গমেন্টেড এবং ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি প্রযুক্তির সাহায্যে সম্ভব হবে।

'মেটা' নামটাও শোনা যাচ্ছে। ফেসবুকের সাবেক কর্মকর্তা সামিদ চক্রবর্তীসহ অনেকে এ নাম প্রস্তাব করেছেন। তা ছাড়া মেটা ডটকমে ঢুকলে সেটি মেটা ডট অর্গ ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়। চ্যান জাকারবার্গ ইনিশিয়েটিভের উদ্যোগে বায়োমেডিকেল গবেষণা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট সেটি। দাতব্য সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন মার্ক জাকারবার্গ ও তাঁর স্ত্রী প্রসিলা চ্যান।

দ্য ভার্জের প্রতিবেদনে ব্র্যান্ড পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে মেটাভার্সের কথাই বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে নতুন একটি মাতৃ-প্রতিষ্ঠান গঠন করে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারসহ প্রতিষ্ঠানটির সব সেবা সেটির অধীন আনা হতে পারে। গুগলের সব সেবা যেমন 'অ্যালফাবেট' নামের প্রতিষ্ঠান গঠন করে সেটির অধীনে নিয়ে যাওয়া হয় ২০১৫ সালে।

'মেটা' নামটি গ্রহণের সম্ভাব্য আরেকটি কারণ হলো, সিলিকন ভ্যালির প্রতিষ্ঠানগুলো সংক্ষিপ্ত নাম পছন্দ করে। এটাকে মর্যাদাকর মনে করে তারা। অ্যালফাবেটের ওয়েবসাইট ঠিকানা যেমন এবিসি ডট এক্সওয়াইজেড। আর তা ছাড়া, মেটা নাম ব্যবহার করলে সেটাকে মেটাভার্সের সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবেই দেখবে মানুষ।

২০১৭ সালে মেটা নামের একটি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করে চ্যান জাকারবার্গ ইনিশিয়েটিভ। গবেষণাপত্র খোঁজার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছিল প্রতিষ্ঠানটি। তাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা মেটা ডট অর্গ।

বিমানের জানালায় অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে কেন?

কোনো কোনো উড়োজাহাজ ১১ হাজার মিটার উঁচুতে ওড়ে। এত উঁচুতে চলা উড়োজাহাজের জানালায় ছিদ্র ব্যাপারটা ভীতিকর মনে হয় না! ব্যাপারটা আসলে উল্টো।

যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই ছিদ্রগুলো করা হয় উড়োজাহাজের নকশা করার সময়। বিমানের ভেতরে থাকে উচ্চ চাপের বায়ু আর বাইরে বায়ুর চাপ অনেক কম। কাজেই বিমানের জানালাকে প্রচুর চাপ সহ্য করতে হয়। জানালাগুলো তৈরি করা হয় এক্রাইলিকের তিনটি স্তর দিয়ে। সবচেয়ে গুরুপূর্ণ হলো বাইরের কাচটি। এটা বাইরের দিকে উন্মুক্ত থাকে। মাঝের কাচটিতে থাকে ছিদ্র। এই ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলোর অন্য নাম বিড হোল। আর যাত্রীদের দিকের কাচটির নাম স্ক্র্যাচ পেইন। বিড হোলগুলো যাত্রীদের কেবিন এবং দুটি কাচের মাঝের স্থানের বায়ুর চাপকে সাম্যাবস্থায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। ফলে কেবিনের বায়ুর চাপ শুধু বিমানের জানালার সবচেয়ে বাইরের অংশের ওপর চাপ দেয়। ছিদ্রটির কারণে মাঝের কাচটির ওপরও চাপ কম পড়ে। আবার তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে জানালার কাচগুলো কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেটা হয় না এই ছিদ্রের কারণে।

আর যদি কোনো কারণে বাইরের কাচটি ভেঙে যায়, মাঝের কাচটি তখন যাত্রীদের সুরক্ষা দিতে পারবে। আবার ছিদ্রের কারণে বায়ুর চাপের ঘাটতি বিমানের বায়ুর চাপনিয়ন্ত্রক সিস্টেম পুষিয়ে নিতে পারবে।

মহাকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে নাসার নভোযান

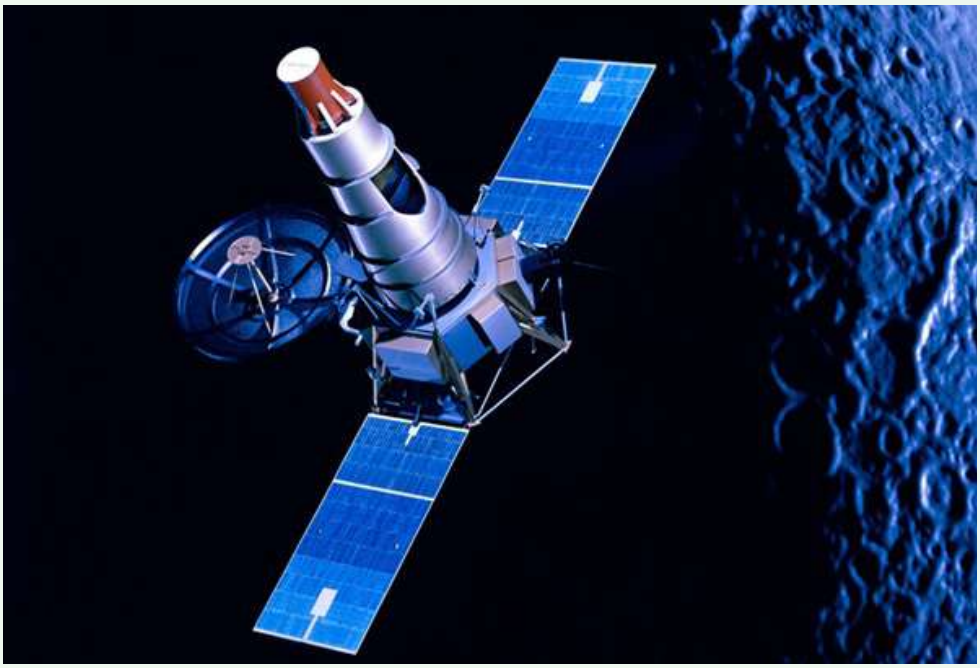

যান্ত্রিক ত্রুটির মুখে পড়েছে নাসার সদ্য পাঠানো নভোযান 'লুসি'। বৃহস্পতি গ্রহকে প্রদক্ষিণরত বেশ কয়েকটি গ্রহাণু পর্যবেক্ষণে ১২ বছরের অভিযানে পাঠানো হয় সেটি।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, সমস্যাটি নভোযানের মূল দুই সোলার প্যানেলের একটিতে। সৌরশক্তি আহরণের মাধ্যমে নভোযানের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে সোলার প্যানেল কার্যকর থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

দ্য ভার্জের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে ১৬ অক্টোবর উড্ডয়ন করে লুসি বহনকারী রকেট অ্যাটলাস ফাইভ। সময়মতো ঠিকঠাক বেরিয়ে আসে লুসির দুই সোলার প্যানেল। তবে কেবল একটি প্যানেল পুরোপুরি মেলে কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পৌঁছেছে। নাসার ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের তথ্য বলছে, সার্বিকভাবে নিরাপদেই আছে লুসি। অভিযানটিও ভেস্তে যায়নি। অন্যান্য যন্ত্রাংশও কার্যকর। তবে অভিযানটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নাসার প্রকৌশলীরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন।

এক ব্লগ পোস্টে নাসা লিখেছে, বর্তমান অবস্থায় কোনো নিরাপত্তা শঙ্কা ছাড়াই কাজ করতে পারবে লুসি। তবে নভোযানটির বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং সোলার অ্যারের

পুনর্বিন্যাসের জন্য পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখছেন প্রকৌশলী দল। নভোযান বিপদে না পড়লেও সোলার প্যানেল পুরোদমে কাজ করাটা জরুরি। এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (এইউ) দূরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী। লুসি যে গ্রহাণুগুলো পর্যবেক্ষণে যাচ্ছে, সেগুলো রয়েছে দ্বিগুণ বা তারও বেশি দূরে। আর পৃথিবীর কক্ষপথে থাকলে যতটা সৌরশক্তি পেত, দুই বা ততোধিক এইউ দূরে থাকলে নভোযান হয়তো তার ৩ শতাংশ শক্তি পাবে।

এ ধরনের মেরামতের কাজ আগেও করেছে নাসা। কক্ষপথে পরিভ্রমণের সময় স্কাইল্যাব মহাকাশকেন্দ্রের সোলার অ্যারের আটকে যাওয়া কবজা ঠিক করেছিল সেবার। ২০০৬ সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রেও একই ধরনের মেরামত করতে হয়েছে। লুসির ক্ষেত্রেও হয়তো তেমন কোনো সমাধান প্রযোজ্য। তবে লুসি এরই মধ্যে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

লুসির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতিগুলোর জন্য সৌরবিদ্যুতের প্রয়োজন। সেগুলো কাজ না করলে অভিযান ব্যর্থ হবে। তবে মহাকাশে গ্রহাণুর মধ্য দিয়ে নভোযানটি চলার জন্য রয়েছে ১৪টি হাইড্রাজিন থ্রাস্টার। ২০২৭ সাল নাগাদ বৃহস্পতির গ্রহাণুগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাবে লুসি। নাসার গবেষকেরা ধারণা করছেন, গ্রহাণুগুলো কার্বন যৌগ দিয়ে তৈরি। এগুলো পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ও জৈব পদার্থের উৎস সম্পর্কে নতুন ধারণা দিতে পারবে।

আইফোন মোছার কাপড় বিক্রি করছে অ্যাপল, দাম ১৯ ডলার

কিডনি না বেচে নাকি অ্যাপলের পণ্য কেনার জো নেই। নিদেনপক্ষে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়।

অ্যাপল এবার এমন একটি পণ্য বাজারে ছাড়ছে, গ্রাহক যেটি কিডনি না বেচেই কিনতে পারবেন। ধারকর্জ করতে হবে কি না, তা অবশ্য বলতে পারছি না।

অ্যাপলের তৈরি ডিভাইসের ডিসপ্লে মোছার জন্য মাইক্রোফাইবার সমৃদ্ধ 'পলিশিং ক্লথ' বাজারে ছেড়েছে গতকাল। সেটির দাম ১৯ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১ হাজার ৬২৭ টাকার মতো। এবং বাংলাদেশি ভাষায় সেটি 'কাচ মোছার ত্যানা'।

অ্যাপলের গতকালের 'আনলিশড' নামের অনুষ্ঠানটির আয়োজন অবশ্য শুধু ত্যানা 'আনলিশ' করার জন্য নয়। বরং তৃতীয় প্রজন্মের এয়ারপডস দেখিয়েছে। সঙ্গে দেখিয়েছে উচ্চ কনফিগারেশনের 'ম্যাকবুক প্রো' সিরিজের দুটি ল্যাপটপ। ল্যাপটপ দুটিতেই আছে ডিসপে (না বললে কি জানতেন?)। ডিসপ্লে থাকলে মাঝেমধ্যে সেটা পরিষ্কার করা জরুরি। এখন অ্যাপলের ল্যাপটপ তো আর পুরোনো জাঙ্গিয়া দিয়ে মোছা যায় না।

অ্যাপল সচরাচর তাদের ডিভাইসের ডিসপ্লে

পরিষ্কার করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে বলে। অ্যাপলের নতুন পরিষ্কারের কাপড়টি যেকোনো ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। সেটা আইফোন, আইপ্যাড, আইপড, ম্যাকবুক থেকে শুরু করে যেকোনো ডিভাইসের ডিসপ্লে।

পণ্যটির বিবরণের ঘরে লেখা রয়েছে, 'নরম উপাদানে তৈরি পলিশিং ক্লথ, যা যেকোনো অ্যাপল ডিসপ্লে নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে পরিষ্কার করে, এমনকি ন্যানো-টেক্সচার কাচও।' এই ন্যানো-টেক্সচার কাচ পরিষ্কারের ব্যাপারটি এসেছে মূলত অ্যাপলের প্রো ডিসপ্লে এক্সডিআর মনিটরের জন্য।

সে যাহোক, আবারও বলছি, কিডনি না বেচে যদি অ্যাপলের কোনো পণ্য কিনতে চান, তো উপায় বাতলে দিলাম।

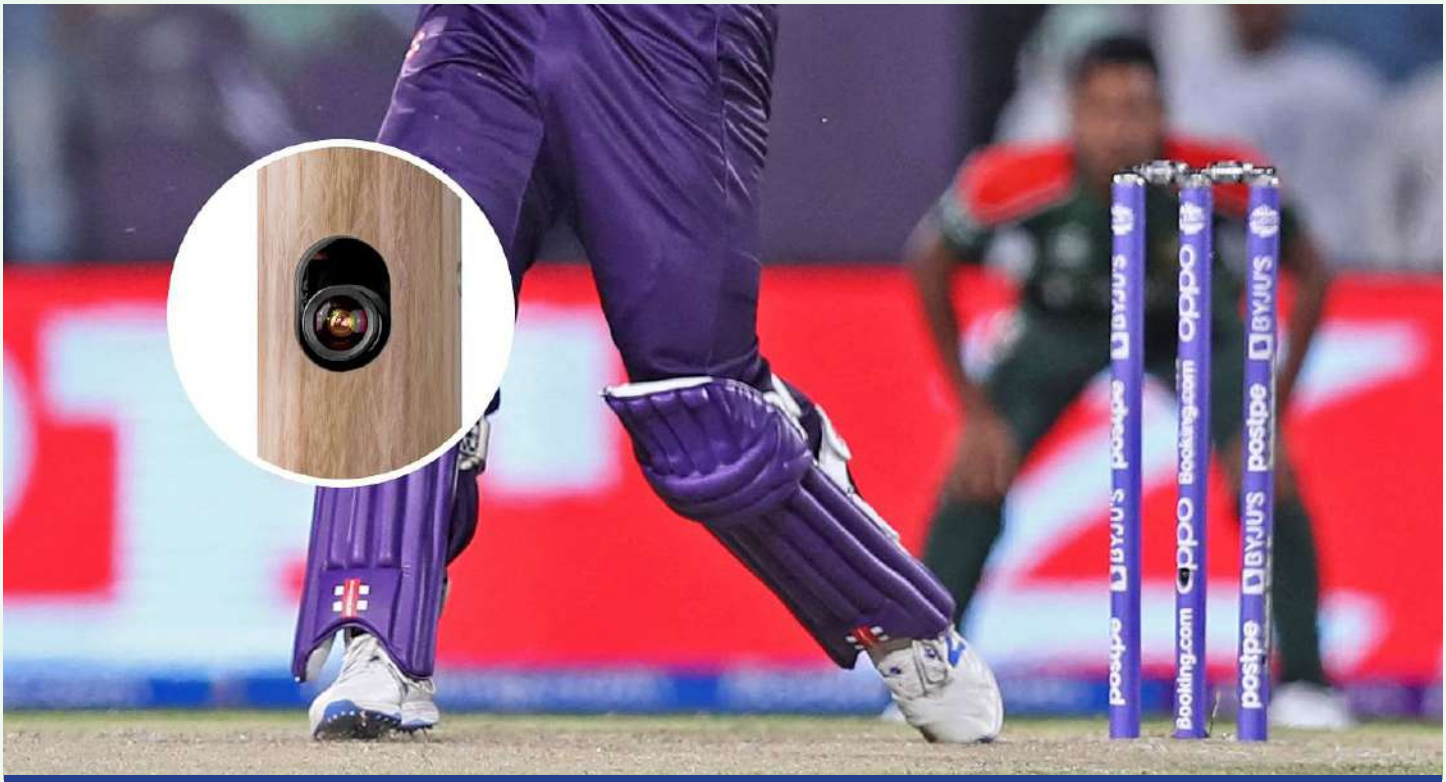

ক্রিকেটে স্টাম্প ক্যামেরা কাজ করে কীভাবে?

ক্রিকেটে স্টাম্প ক্যামেরার চল নতুন নয়। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিবিসি প্রথম মাঝের স্টাম্পে হিটাচি কেপি-ডি ৮এস মডেলের খুদে ক্যামেরা যুক্ত করে। স্টাম্প ক্যামেরায় মূলত পিচ এবং ব্যাটসম্যানের 'অ্যাকশন' ধারণ করা হয়। শট বিশ্লেষণের পাশাপাশি টিভি সম্প্রচারের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, ভিন্ন কোণ থেকে দেখার সুযোগ পান দর্শকেরা। তবে স্টাম্পে যুক্ত খুদে ক্যামেরার ভিডিও টিভিতে সরাসরি দেখানো হয় কীভাবে?

তারহীন ইন্টারনেটের এ যুগে এমন প্রশ্ন ঠিক জুতসই নয়। তবে গুগল করে যত দূর জানা গেল, তাতে তারহীন প্রযুক্তির স্টাম্প ক্যামেরার ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি। খুদে ক্যামেরাটি কীভাবে কাজ করে, তার ব্যাখ্যা ফক্স ক্রিকেটের একটি ভিডিওতে পাওয়া যায়।

ক্যামেরা যে স্টাম্পে থাকে, সেটি থেকে একটি তার বেরিয়ে খানিকটা পেছনে মাটির নিচে থাকা 'জংশন বাক্সে' যুক্ত করা হয়। সংযোগের তারও থাকে মাটির নিচে। ওই জংশন বাক্স যুক্ত থাকে টিভি সম্প্রচার ব্যবস্থার সঙ্গে। এই হলো ব্যাপার।

আগে শুধু স্টাম্পের একদিকে ক্যামেরা থাকত, এখন দুই দিকেই থাকে। এতে

উইকেটকিপারের পাশাপাশি উইকেট থেকে বলার দৌড়ে আসার ভিডিও দেখানো সম্ভব হয় টিভিতে। স্টাম্পিং, রানআউট, এলবিডব্লু, কখনো কখনো ক্যাচের বৈধতার সমাধানও দেওয়া হয় স্টাম্প ক্যামেরার ভিডিও দেখে।

বলের আঘাতে স্টাম্প ভাঙে না কেন?

আরেকটি প্রশ্ন হলো, স্টাম্পে সরাসরি বল লাগলেও ক্যামেরা ভাঙে না কেন? স্টাম্প ক্যামেরা ভাঙা অসম্ভব নয়। আবার একদম সহজও নয়। প্রথমত, বল সরাসরি ক্যামেরায় লাগে না। শক্তপোক্ত স্টাম্প ভাঙলে তবেই আসে ক্যামেরা ভাঙার প্রশ্ন। তা ছাড়া ক্যামেরা স্টাম্পের সঙ্গে শক্ত করে যুক্ত থাকে না। বল স্টাম্পে আঘাত করার সময় ক্যামেরা খানিকটা পিছিয়ে যায়। এতে বলের আঘাতের ইমপ্যাক্ট কিছুটা হলেও কমে। এ কারণেই ক্রিকেটে ক্যাচ ধরার সময় আমরা হাত খানিকটা পিছিয়ে আনি।

কয়েক ঘণ্টায় ৬০০ কোটি ডলার ক্ষতি

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ প্রায় ছয় ঘণ্টা অফলাইন বা বন্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধার মার্ক জাকারবার্গের ৬০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে।

বিশ্বের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকেও একধাপ নিচে নেমে গেছে ফেসবুকের এই সহ-প্রতিষ্ঠাতার নাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদমাধ্যম বুমবার্গের প্রতিবেদনে এমনটি জানানো হয়েছে।

শেয়ার বাজারেও ধসের মুখে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার ফেসবুকের শেয়ারের ৪ দশমিক ৯ শতাংশ দরপতন হয়। এতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝির পর থেকে দরপতন হলো ১৫ শতাংশ।

সোমবার দিনের শেষে জাকারবার্গের সম্পদের পরিমাণ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ছয় বিলিয়ন ডলার কমে ১২১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ১৪০ বিলিয়ন ডলার থেকে কমতে কমতে জাকারবার্গের সম্পদের পরিমাণ ১২১ বিলিয়নে নেমে গেল।

ব্লুমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ধনীদের

তালিকায় বিল গেটসের নিচে পঞ্চম অবস্থানে চলে গেছে মার্ক জাকারবার্গের নাম।

সার্ভার ডাউন হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ তাঁদের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ প্যাটফর্মের মাধ্যমে বন্ধু, পরিবার ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় সোমবার সকাল পৌনে ১১টার দিকে এ বিভ্রাট শুরু হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি গতকাল সোমবার রাত পৌনে ১০টার পর থেকে বাংলাদেশেও এ সমস্যা দেখা দেয়।

শেয়ার বাজারেও ধসের মুখে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্যাটফর্ম ফেসবুক। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার ফেসবুকের শেয়ারের ৪ দশমিক ৯ শতাংশ দরপতন হয়। এতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝির পর থেকে দরপতন হলো ১৫ শতাংশ।
সোমবার দিনের শেষে জাকারবার্গের সম্পদের পরিমাণ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ছয় বিলিয়ন ডলার কমে ১২১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ১৪০ বিলিয়ন ডলার থেকে কমতে কমতে জাকারবার্গের সম্পদের পরিমাণ ১২১ বিলিয়নে নেমে গেল।

ব্লুমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ধনীদের তালিকায় বিল গেটসের নিচে পঞ্চম অবস্থানে চলে গেছে মার্ক জাকারবার্গের নাম। সার্ভার ডাউন হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ তাঁদের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ প্যাটফর্মের মাধ্যমে বন্ধু, পরিবার ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় সোমবার সকাল পৌনে ১১টার দিকে এ বিভ্রাট শুরু হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি রাত পৌনে ১০টার পর থেকে বাংলাদেশেও এ সমস্যা দেখা দেয়।

চীনে বন্ধ হচ্ছে মাইক্রোসফটের লিঙ্কডইন

চীনে সামাজিক নেটওয়ার্ক লিঙ্কডইন বন্ধ করে দিচ্ছে মাইক্রোসফট। মূলত চীনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ক্রমশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ায় এ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিটিকে। সম্প্রতি কিছু সাংবাদিকের প্রোফাইল বক করার জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ক্যারিয়ার-নেটওয়ার্কিং সাইটটি। আর এরপরই এই সিদ্ধান্ত। বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

লিঙ্কডইন এই বছরের শেষের দিকে ইনজবস নামে একটি সাইট চালু করবে, যা কেবল চাকরির সংস্করণ। এতে সামাজিক ফিড বা শেয়ার অথবা নিবন্ধ পোস্ট করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

লিঙ্কডইনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাক শ্রফ এক বগ পোস্টে বলেন, 'আমরা চীনে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও চ্যালেঞ্জিং অপারেটিং পরিবেশ পাচ্ছি এবং সবকিছুতে অনেক বেশি সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হচ্ছি। তিনি আরও বলেন, এ বছরের শেষের দিকে আমরা চীনে এখনকার ভার্সন বন্ধ করব। তবে চীনে আমাদের শক্তিশালী উপস্থিতি অব্যাহত রাখব। নতুন ইনজবস অ্যাপ চালু করা হবে।'

লিঙ্কডইন চীনে একমাত্র প্রধান পশ্চিমা

সামাজিক মিডিয়া প্যাটফর্ম ছিল। ২০১৪ সালে চীনা সরকারের নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে সম্মত হয়ে এটি চালু হয় এবং তারা কীভাবে ব্যবসা করছে, সে বিষয়ে স্বচ্ছ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে সরকারি সেন্সরশিপের বিষয়ে অসম্মতি জানায়।

সম্প্রতি, লিঙ্কডইন তার চীনভিত্তিক ওয়েবসাইট থেকে মেলিসা চ্যান এবং গ্রেগ বরুনোর অ্যাকাউন্টসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের অ্যাকাউন্ট কালো তালিকাভুক্ত করেছে। সম্প্রতি গ্রেগ ব্রুনো তিব্বতি শরণার্থীদের সঙ্গে চীনের আচরণ নিয়ে একটি বই লিখেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, তাঁর বই যে চীনা সমাজতান্ত্রিক সরকারের পছন্দ হবে না, এতে তিনি অবাক হননি, তবে একটি মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানি বিদেশি সরকারের দাবি মেনে নিচ্ছে দেখে তিনি হতাশ।

মার্কিন সিনেটর রিক স্কট লিঙ্কডইনের প্রধান নির্বাহী রায়ান রোজলানস্কি এবং মাইক্রোসফটের প্রধান সত্য নাদেলাকে লেখা এক চিঠিতে এই পদক্ষেপকে 'তুষ্টকরণ ও কমিউনিস্ট চীনের কাছে আত্মসমর্পণ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে লিঙ্কডইনের এই পদক্ষেপ চীন চাপের নাকি যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারণ করেছে, তা এখনো বলা কঠিন।

ব্যবসা করতে টাকা লাগে না, বুদ্ধি লাগে.!!!

টাকা ছাড়া আবার ব্যবসা হয় নাকি! কিন্তু কথাটা মোটেও সত্য নয়। আমার কথা শুনে অবাক হয়ে হয়ত বলবেন পাগলের প্রলাপ বকছি। কিন্তু আপনাদের আজ সে রকম কিছু ব্যবসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যা করতে প্রয়োজন হয় না টাকার।

এমন অনেকই এ ধরনের ব্যবসা করছেন আপনার পাশেই। আর আপনি তাদের পাশেই অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে ব্যবসা খুজছেন!

বর্তমান সময়ে এসে ব্যবসায়ের পরিধি ও ধরনেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আর সেই সাথে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কিছু সুযোগ। আর সেই সুযোগ গুলো ব্যবহার করতে জানলেই আপনি শুরু করতে পারবেন ব্যবসায়। তাও আবার বিনা পুঁজিতে। এক্ষত্রে বিনিয়োগ বলতে শুধুই আপনার যোগাযোগ আর মেধা। পরিচিতি ও বিশ্বাস যোগ্যতা বাড়াতে পারলেই আপনার ব্যবসায়ের পরিধি দিনকে দিন বাড়তেই থাকবে।

মধ্যস্থতাকারী শব্দটার সাথে সবাই কমবেশী পরিচিত। আমরা অনেকেই এদেরকে দাদাল বলে অবজ্ঞা করে থাকি কিংবা পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধও করি। বড় ব্যবসায়ী হতে হলে দালাল হোন আগে শিরোনামে একটি লেখা

প্রকাশ করেছিলাম পেইজে। যারা লিখাটি পড়েননি দেখে নিতে পারেন। তাই আজ দালাল সম্পর্কিত বিস্তারিত কিছুই বলব না।

আপনার বাসার কাছের মাঠেই সবজি উৎপাদন হচ্ছে অথবা ফার্মে উৎপাদিত হচ্ছে ব্রয়লার মুরগী কিংবা ডিম। আর তা শহর থেকে বড় বড় পাইকাররা ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের অস্থায়ী প্রতিনিধির মাধ্যমে। আপনি কেন পারছেন না তাদের প্রতিনিধির জায়গা দখল করতে। অথবা আপনার প্রতিবেশী সেই সল্পশিক্ষিত কৃষকটির ফসলের দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়ে বিক্রয় করতে। যেখানে আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবেনা কোন অর্থই। শুধু দুপক্ষের মধ্যে বিশ্বস্থতা অর্জন করে কাজ করতে হবে। সবজি দিয়ে উদাহরন দিলাম এমন অনেক কৃষি ও কৃষিজাত পন্য আছে যা থেকে আপনি আপনার ব্যবসায়ের যাত্রা শুরু করতে পারবেন অনায়াশেই। শুধু দরকার আপনার ইচ্ছাশক্তি আর কর্মপ্রচেষ্টা।

শহর এলাকায় বাসা পাল্টানো একটি নিত্য ব্যাপার। আর এই বাসা বদলের মাঝে লুকিয়ে আছে আপনার ব্যবসা। ভাবছেন কিভাবে? আপনি পরিচিতি বাড়ান এলাকায় আর যোগাযোগ করুন এমন কিছু লোকের সাথে যারা ছোট মিনি ট্রাক বা ট্রাক ভাড়া দিয়ে থাকে। আর কিছু লেবার শ্রেনীর দক্ষ লোকের সাথে যোগাযোগ রাখুন যারা বাসা পাল্টাতে আসবাবপত্র স্থানান্তরের কাজটি করবে। প্রচরণা চালান আর যারা বাসা বদলাবে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চুক্তিতে বাসা বদলের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হোক আপনার বিনা পুঁজির ব্যবসা।

ঠিক এভাবেই বাসা বাড়িতে অথবা অফিস কিংবা বিপনী বিতান গুলোতে বিশ্বস্থ নিরাপত্তা রক্ষী সরবরাহ করে শুরু করতে পারেন সিকিউরিটি সার্ভিসেস ব্যবসা। প্রতিমাসের বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান আয় দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন একটু পরিশ্রম করলেই। শুধু সিকিউরিটি নয় বর্তমানে হাসপাতাল থেকে শুরু করে বড় বড় মার্কেট ও অফিস গুলোতে ক্লিনারও সরবরাহ করতে পারবেন।

কিছু মেকানিকের সাথে পরিচয় করুন এবং ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এরা মটর মেকানিক, সাটার মেকানিক, ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স, থাই এল্যুমিনিয়াম মেকানিক, থেকে শুরু করে এসি কিংবা জেনারেটর সার্ভিসিং এর কাজে অভিজ্ঞতা আছে এমন। এবার শুরু হোক

আপনার যাত্রা। বাসা বাড়ির কাজ সংগ্রহের জন্য সকলকে জানানো শুরু করুন। কাজ চুক্তিতে নিয়ে মেকানিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে আপনি একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাতে রাখুন কাজের ওপর ভিত্তি করে।

এবার আসি আরও কিছু স্মার্ট ব্যবসা নিয়ে যা থেকে আপনি আয় করতে পারবেন। তবে এজন্য আপনাকে কাজ জানতে হবে। পরিচিতিও বাড়াতে হবে অনেক বেশী। সদ্যজাত কোন কোম্পানীর উৎপাদিত পন্য বিক্রয়ের দায়িত্ব নিয়েও শুরু করতে পারেন আপনার ব্যবসা। আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়া, বিমান ভাড়া, কন্টেইনার ভাড়া করে দিয়েও শুরু করতে পারেন। তাছাড়া জমি কিংবা ফ্ল্যাট বিক্রয় ব্যবসার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে শুরু করতে পারেন আপনার ব্যবসা।

উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন যার চোখে দিনের আলোর মত জ্বলে সে শুন্য থেকেই এর যে কোন একটি ব্যবসা দিয়ে শুরু করে এগিয়ে যেতে পারবেন। আরও অনেক ব্যবসায় আছে যা কোন রকম প্রাথমিক বিনিয়োগ ছাড়াই করা সম্ভব। যারা টাকা নাই বলে শুরু করতে পারছেন না বলে কারন দর্শান তাদের জন্য নেটিশ একটাই চোখ থেকে টিনের চশমা টা খুলুন আর যা আছে তা নিয়েই শুরু করুন যা নেই তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার কি।

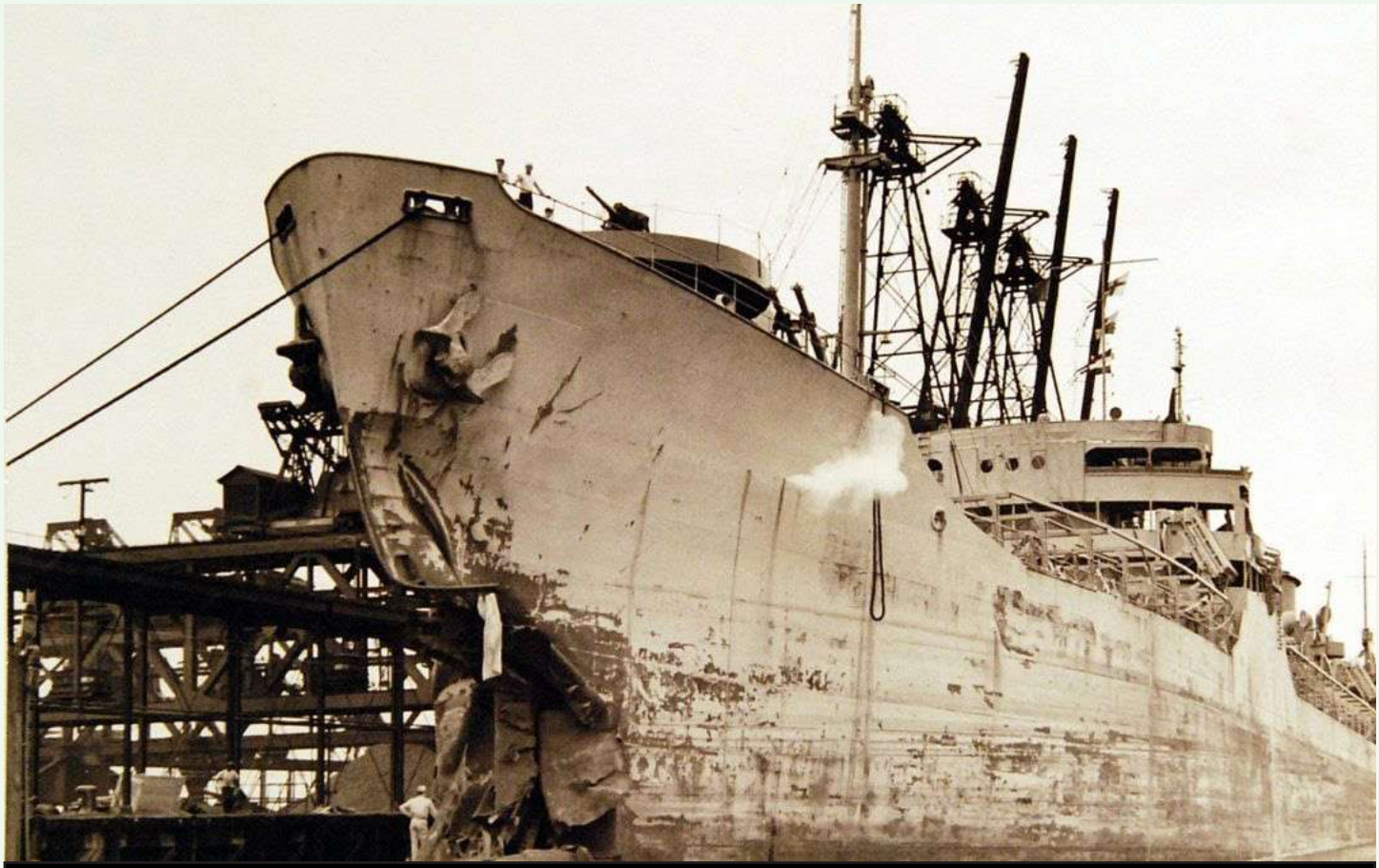

পুরোনো জাহাজে হাজার পণ্যের ব্যবসা

আলপিন থেকে শুরু করে জেনারেটর, রান্নাঘরের তৈজসপত্র থেকে শিল্পের কাঁচামালড়সবই বিক্রি হয় জাহাজভাঙা শিল্পে। বছরে এ বাজারের আকার প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার।

জাহাজভাঙা শিল্পের মুদ্রার এক পিঠে পরিবেশদূষণ আর দুর্ঘটনা। অন্য পিঠে বাণিজ্য। এই বাণিজ্য মূলত হরেক রকমের পণ্য বেচাকেনার। শিল্পকারখানার কাঁচামাল থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক পণ্য, কী নেই তাতে? আবার যেসব পণ্য দেশে ব্যবহারের সুযোগ নেই, সেগুলো রপ্তানিও হচ্ছে। জাহাজ কাটাকুটির এই বাণিজ্যের আকার বছরে কমবেশি ১৫ হাজার কোটি টাকার। জাহাজের যত লোহা আছে, তার প্রায় সবই পুনর্ব্যবহার করা যায়। ক্ষতিকর বর্জ্য ছাড়া জাহাজের আর কোনো কিছুই যেন ফেলনা নয়। একটি জাহাজে যেমন থাকে বড় আকারের রসুইঘর, তেমনি থাকে নাবিকদের আবাসন, চিকিৎসা, স্টেশনারি। আবার জাহাজ চালানোর জন্য থাকে জেনারেটর ও যন্ত্রপাতি। সরল হিসাবে, আলপিন থেকে শুরু করে নাটবল্টু, রান্নাঘরের জিনিস থেকে শিল্পকারখানার কাঁচামাল এমন হাজারো

পণ্য থাকে পুরোনো জাহাজে।

চট্টগ্রাম কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২০-২১ অর্থবছরে যত জাহাজ আমদানি হয়েছে, তার শুল্ক-করসহ আমদানি মূল্য ছিল ৯ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা। জাহাজের দাম ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকায় বাজারমূল্যও বেড়ে যায়। কয়েক মাস ধরে প্রতি টন লোহা বিক্রি হচ্ছে গড়ে ৬০০ ডলারে। এ হিসাবে শুধু লোহা বিক্রির বাজারের আকার প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার। আবার জাহাজের সরঞ্জামের বাজার দুই হাজার কোটি টাকার বেশি। এ দুইয়ে মিলিয়ে বাজারের আকার ১৫ হাজার কোটি টাকার। আমদানিকারক থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত কয়েক দফা হাতবদল হয়ে বাজারের আকারও বড় হয়।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবু তাহের বলেন, পুরোনো জাহাজ থেকে অসংখ্য পণ্য পাওয়া যায়। বিশ্ববাজারে দাম বাড়ায় এখন বাজারের আকারও বেড়েছে। এখনকার হিসাবে তা ১৫ হাজার কোটি টাকার কম হবে না।

জাহাজভাঙা বাণিজ্যের প্রথম ধাপে আছেন আমদানিকারক বা ইয়ার্ডমালিকেরা। জাহাজ আমদানির পর তা বিক্রির জন্য ধারাবাহিকভাবে নিলামের আয়োজন করেন জাহাজভাঙা কারখানার মালিকেরা। ঢাকা ও চট্টগ্রামের হাজারখানেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আছে, যারা নিলামে অংশ নেয়। নিলামে সর্বোচ্চ দরে জাহাজের পণ্য বিক্রি করেন কারখানামালিকেরা। বিক্রির পর তা জাহাজ থেকে কেটে বা পণ্য স্থানান্তর করে ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। একেকটি বড় জাহাজ আমদানির পর বিক্রি করতে ছয় থেকে এক বছরের মতো সময় লেগে যায়।

নিলামে যাঁরা পণ্য পান, তাঁরা সরাসরি বা তাঁদের কাছ থেকে পণ্য কিনে নেন ছোট ব্যবসায়ীরা। জাহাজভাঙা পণ্য বেচাকেনা হয় ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানে। চট্টগ্রামের বাঁশবাড়িয়া থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত মহাসড়কের আশপাশে অসংখ্য দোকান রয়েছে, যেগুলোতে জাহাজভাঙা পণ্য বিক্রি হয়। এ ছাড়া পাহাড়তলী সিডিএ মার্কেট, সাগরিকা, পশ্চিম মাদারবাড়ী, কদমতলী ও মুরাদপুর এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বিক্রি হয়। ঢাকার ধোলাইখাল ও সদরঘাটেও বিক্রি হয় চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা পণ্য।

পুরোনো জাহাজের হরেক পণ্য

একটি জাহাজের কথাই ধরা যাক। জাহাজের বেশির ভাগ অংশই লৌহজাত পণ্য। জাহাজের শরীরজুড়ে থাকা লোহা লম্বা পেটের আকারে কাটা হয়। এই পেট ব্যবহৃত হয় আধা স্বয়ংক্রিয় রড তৈরির কারখানায়। জাহাজ ভেদে এ হার মোট লৌহজাত পণ্যের কমবেশি ৫০ শতাংশ। আবার অভ্যন্তরীণ নৌপথের জন্য নির্মিত হওয়া অনেক জাহাজে ব্যবহৃত হয় ভাঙা জাহাজের লোহার পেট। এ হার বড়জোর ৫ থেকে ১০ শতাংশ। জাহাজ কাটাকুটির পর ছোটখাটো লোহার টুকরা ও লোহার যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়। এসব লোহার টুকরা সহজেই চুল্লিতে গলানো যায়। স্বয়ংক্রিয় রড তৈরির কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এসব লোহার টুকরা। এর পরিমাণ জাহাজের মোট লোহার ২৫-৩০ শতাংশ। এ ছাড়া সনাতন কারখানায় ব্যবহৃত হয় ১০ শতাংশ লোহার ভারী টুকরা। এ রকম অন্তত সাতটি শিল্পকারখানার কাঁচামালের জোগান আসে জাহাজভাঙা শিল্প থেকে।

জাহাজে শিল্পকারখানার কাঁচামাল ছাড়াও থাকে বাণিজ্যিক পণ্য। সম্প্রতি সীতাকুন্ড, পাহাড়তলী সিডিএ মার্কেট, সাগরিকা রোড ও মাদারবাড়ী এলাকা ঘুরে দেখা যায়, পুরোনো জাহাজের পণ্য বিক্রির সারি সারি দোকান। পশ্চিম মাদারবাড়ী এলাকায় বেশির ভাগ

পণ্যের মধ্যে রয়েছে লোহার পাইপ। কদমতলীতে দেখা যায় নাটবল্টুর দোকান। সাগরিকা রোডে বিক্রি হয় বড় বড় পাইপ, যন্ত্রপাতিসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তবে বাঁশবাড়িয়া থেকে ফৌজদারহাট পযন্ত মহাসড়কের পাশে সারি সারি দোকানে সব ধরনের পণ্যই বিক্রি হয়। সবই ব্যবহৃত পণ্য।

জাহাজের বড়-ছোট জেনারেটর, বৈদ্যুতিক তার বিক্রি হয় পাহাড়তলী সিডিএ মার্কেটের বিভিন্ন দোকানে। সেখানকার গাউসিয়া আয়রন মার্টে দেখা যায়, সার্কিট ব্রেকার, জেনারেটর ও তার বিক্রি হচ্ছে। ভাটিয়ারীর শীতলপুরে একটি দোকানে দেখা যায় স্তুপ করে রাখা নাটবল্টু। দোকানের মালিক শুভংকর দাস জানান, তাঁর দোকানে শুধু নাটবল্টুসহ লোহার সরঞ্জাম রয়েছে। জাহাজভাঙা কারখানা থেকে নিলামে কিনে খুচরায় বিক্রি করেন। দোকান ঘুরে রান্নাঘরের তৈজসপত্র, শোপিস, ব্যায়ামের সরঞ্জাম, এয়ারকন্ডিশনার, বৈদ্যুতিক

পাখা, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, বৈদ্যুতিক তার, সাউন্ডবক্স, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার ও টেলিভিশন বিক্রি হচ্ছে।

ভাটিয়ারির আরেকটি দোকানের মালিক মো. রাসেল প্রথম আলোকে বলেন, জাহাজভাঙা কারখানা থেকে নিলামে আসবাব কিনে বিক্রি করেন তিনি। আকারভেদে একেকটি জাহাজ থেকে কয়েক লাখ থেকে কোটি টাকার ফার্নিচার নিলামে বিক্রি হয়। বাণিজ্যিক পণ্যের পাশাপাশি অনেক পণ্য আছে, যেগুলো রপ্তানি হয়। জাহাজের সবচেয়ে দামি পণ্য হলো প্রপেলার। বড় জাহাজের প্রপেলার বিক্রি হয় কমবেশি পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকায়। তামা, পিতল, মরিচারোধী ইস্পাতের সরঞ্জামের মতো অনেক পণ্যও রপ্তানি হয়।

জাহাজভাঙা শিল্পের উদ্যোক্তারা জানান, জাহাজ আমদানি করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৫ থেকে ৬০টি। এই জাহাজের নানা পণ্য বেচাকেনার সঙ্গে কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান জড়িত। জাহাজভাঙা শিল্পের বাইরে ব্যবহৃত পণ্য বেচাকেনায় বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ই-কমার্স সংকট সমাধানে এখনো যে সুযোগ রয়েছে

বেশ কিছুদিন ধরে দেশের সবচেয়ে বেশি আলোচনার একটি বিষয় হচ্ছে ই-কমার্স। গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল এই খাতটিতে কিছুটা হলেও আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনা হতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে এ সংকট কেটে যাবে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি যেন আর না হয়, তার জন্য প্রয়োজন সতর্কতা ও সঠিক পদক্ষেপ।

২০২০ সালের আগস্ট মাসে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) সাত সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে। আমরা সেই কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ওই সময়ের কিছু পর্যবেক্ষণ এবং বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে আমাদের মনে হয়েছে, কিছু বিষয় সামনে তুলে ধরার যে দায়িত্ব, সেটি এড়ানোর সুযোগ নেই। আমরা দাবি করছি না আমাদের কথাগুলো শতভাগ ত্রুটিমুক্ত; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ যেন আমাদের কথাগুলো সুবিবেচনায় নেওয়ার সুযোগটুকু পান, সেই কারণেই এই লেখা।

কাদের ব্যর্থতায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে,

তা নিয়ে আলোচনা করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের হাতে কী কী সুযোগ রয়েছে, সেটি নিয়েই আমরা কথা বলতে চাই। এখানে বাস্তবতাকে মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যৌক্তিক হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বেলায় ডিসকাউন্ট, অফার বা ছাড় দিয়ে গ্রাহক আকর্ষণ করার উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু সেটি আগের গ্রাহকের টাকা নিয়ে পরের গ্রাহককে ছাড় দেওয়া নয়। গ্রাহক বাড়ানোর জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিনিয়োগ বা লাভ থেকে সেই ছাড় দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, 'মানুষ সেখানে বিনিয়োগ করল কেন? আমরা কি তাদের বিনিয়োগ করতে বলেছি?' এ ধরনের যুক্তিও জুতসই নয়। যে দেশের গণপরিবহনে এখনো লেখা থাকে 'অপরিচিত লোকের দেওয়া কিছু খাবেন না', যে দেশে এখনো ছেলেধরা সন্দেহে দিনদুপুরে মানুষ মেরে ফেলা হয়, সে দেশের মানুষ নিজেই বুঝে ফেলবে, ই-কমার্স সাইট বিনিয়োগের জন্য নয়, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এটা খানিকটা বাহুল্য রকমের প্রত্যাশা। রাষ্ট্রের কোনো কার্যকর হস্তক্ষেপ ছাড়া মাসের পর মাস একাধিক প্রতিষ্ঠান যখন কইয়ের তেলে কই ভাজার মতো গ্রাহকের টাকা দিয়ে গ্রাহককেই বুঝ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সাধারণ মানুষের এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছেড় ই-কমার্স বুঝি ডিজিটাল দুনিয়ার নতুন এক চমক, নতুন এক উদ্ভাবন, যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি বিনিয়োগও করা যায়।

এবার আসি সমাধানের প্রশ্নে। কারও ফ্লাইট ছিল রাত ১০টায়, তিনি যদি রাত ১১টায় বিমানবন্দরে পৌঁছে বলেন, সমাধান কী? এর কোনো সমাধান নেই। কারণ, বিমান ইতিমধ্যে ছেড়ে চলে গেছে। যেটি হতে পারে, সেটির নাম সমাধান নয়, সেটিকে ড্যামেজ কন্ট্রোল বা ক্ষতির পরিমাণ কমানো বলা যেতে পারে। ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন ক্ষতি কীভাবে কমানো যায়, সেটি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আমরা ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা কমিটি গঠনের কথা জানতে পেরেছি।আমাদের ভাবনা অনুযায়ী 'নিয়ন্ত্রণকারী' না হয়ে 'সমন্বয়কারী' বা 'উন্নয়নকারী' জাতীয় শব্দ হলে ইতিবাচক শোনাবে। ই-কমার্স মশা কিংবা করোনাভাইরাস নয় যে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বরং ই-কমার্সের উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষ হতে পারে, যারা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে ই-কমার্স পরিচালনা

করছে, তাদের জন্য ব্যবসা পরিচালনা করা সহজ হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য দুটি দিক নিয়ে কাজ করা যেতে পারে, ১. ইতিমধ্যে 'ডুবে যাওয়া জাহাজ'গুলো, অর্থাৎ ইভ্যালির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে গ্রাহকদের যতটুকু সম্ভব অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা; এবং ২. ই-কমার্সের উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষ গঠনসহ একটি উন্নয়নমুখী স্ট্র্যাটেজি বা রোডম্যাপ গ্রহণ করা, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটে।

দ্বিতীয় উপায় হিসেবে আলোচিত হয়েছে, সরকারের সব দেনা পরিশোধ করে দেওয়ার কথা। এখানে অনেক প্রশ্ন রয়েছে, কেন সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এই বিপুল দেনা পরিশোধ করবে? লোভের ফাঁদে পা দেওয়া লোকজনকে রক্ষা করা সরকারের দায় কতটুকু? প্রথমত, ইভ্যালির এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য একেবারেই নতুন একটি অভিজ্ঞতা, যেহেতু ই-কমার্স সেক্টরের উত্থান এ দেশে নতুন। ফলে এর থেকে দ্রুত নিস্তার পেতে অত্যন্ত সাবধানে, সবার সহযোগিতায় একটি উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। ইভ্যালির ঘটনা চাউর হওয়ার পর থেকে বেশ কিছু মতামত বিভিন্ন মাধ্যমে এসেছে। মূলত দুটি সমাধানের কথা আলোচনায় এসেছে, ১. আইনি পদ্ধতিতে ইভ্যালি অবসায়নের মাধ্যমে যা সম্পদ আছে তা বিক্রি করে পাওনাদারদের টাকা বুঝিয়ে দেওয়া; এবং ২. ইভ্যালির গ্রাহকদের পাওনা সব টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা।

চলুন দেখে নিই কেন এই দুটি উপায়ের কোনোটিই বাস্তবতার নিরিখে সমাধান দিতে

পারে না। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ইভ্যালির এই মুহূর্তে মোট দায় আছে ৫০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা, অন্যদিকে সম্পদ আছে ১০০ কোটি টাকার মতো। এখন এই কোম্পানির অবসায়ন ঘটিয়ে এর সম্পদ বিক্রি করতে গেলে 'ফায়ার সেল' মূল্য ১০০ কোটি টাকা কখনোই পাওয়া যাবে না। এই সম্পদমূল্য অবচয় নির্ধারণের পরে কি না, সেটিও নিশ্চিত নই। ফলে সব বিবেচনায় হয়তো মোট সম্পদের সর্বোচ্চ ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ দাম পাওয়া যেতে পারে। যদি ৭০ কোটি টাকাও উদ্ধার করা যায়, তবে তা দিয়ে মোট দায়ের (১০০০ কোটির অনুপাতে) মাত্র ৭ শতাংশ পাওনা মেটানো সম্ভব হবে। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় ৯০ শতাংশের বেশি দায় পরিশোধ সম্ভব হবে না। যেখানে আমরা বুঝতেই পারছি, এই প্রক্রিয়ায় ৯০ শতাংশ বা তার বেশি দেনা পরিশোধ করা সম্ভব নয়, সেখানে আইনি পদ্ধতি প্রয়োগ করে অবসায়নের এই সুপারিশ আমাদের কাছে বাস্তবসম্মত নয় বলেই মনে হয়েছে।

যদি ইভ্যালির ক্ষেত্রে করে, তাহলে অন্যগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন ধামাকা কিংবা রিং আইডি, এসবের ক্ষেত্রে কী হবে? এভাবে বারবার নানা উপায়ে সুযোগ-সন্ধানী মানুষ লোভের বশবর্তী হওয়া সাধারণ মানুষকে ঠকাবে আর সরকার গিয়ে জনগণের হাজার কোটি টাকা খরচ করে তাদের উদ্ধার করবে, এ কেমন প্রস্তাব? তা ছাড়া যদি ই-কমার্স খাতে সরকার এই সুবিধা দেয়, তাহলে ডেসটিনি কিংবা যুবকের কী হবে?

এতসব প্রশ্নের ভিড়ে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কোনোভাবেই জনগণের ট্যাক্সের টাকা এই খাতে সরকারের খরচ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ধরে নিলাম সরকার ইভ্যালির ক্ষেত্রে এই বিশাল অঙ্কের জনগণের টাকা ব্যয় করে ইভ্যালির অবসায়ন ঘটাল। তাতে কিন্তু ইভ্যালির মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে একেবারেই শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া হবে, যার ৪৫ লাখ গ্রাহক, কয়েক হাজার মার্চেন্ট এবং একটি সু-প্রতিষ্ঠিত ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের অদৃশ্য সম্পদ রয়েছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশে, যে কোনো খাতের ব্যবসাতেই এত বড় একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা কঠিন এবং অবসায়নের মাধ্যমে এই পুরো নেটওয়ার্ককে আমরা ধ্বংস করে দিতে বলছি। এই সুপারিশ কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ইভ্যালির দোষ খুঁজতে গিয়ে গুণের দিকগুলো বিবেচনায় না নিলে কী করে হবে। অনেকেই বলতে পারেন, নানা ধরনের লোভনীয় অফার দিয়ে এই কাস্টমার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, যা এত

কিছুর পরে আর কাজে আসবে না। ইভ্যালির বর্তমান অবস্থা যা-ই হোক, ৪৫ লাখ সাধারণ মানুষের যে কাস্টমার বেজ, সেটা তো আর মুছে যায়নি। এই সংখ্যক গ্রাহককে ব্যবহার করে এক ক্লিকেই ৪৫ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

অনেকেই বলতে পারেন, এই গ্রাহকসংখ্যা অভাবনীয় অফারের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, এরা প্রকৃত গ্রাহক নয়। এই যুক্তিও আংশিক সত্য। বিশ্বের অনেক নামীদামি প্রতিষ্ঠান অফারের মাধ্যমে গ্রাহক সৃষ্টি করে। তাদের কেউই আশা করে না যে অফারের মাধ্যমে সৃষ্ট গ্রাহকের শতভাগ নিয়মিত গ্রাহক হবে। বরং পরবর্তী সময়ে তাদের লক্ষ্য থাকে, এই গ্রাহকের একটি অংশ নিয়মিত গ্রাহকে পরিণত হয়ে সেটি ব্যবসাকে বিকশিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ইভ্যালির গ্রাহকসংখ্যার যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্যালু রয়েছে, তাই ইভ্যালিকে ধ্বংস করে দেওয়াটা আমরা মনে করি একটি অবিবেচনা প্রসূত কাজ হবে।

তাহলে উপায় কী? এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি কার্যকর এবং উদ্ভাবনী মডেল প্রস্তাব করতে চাই, যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সম্ভব দায় পরিশোধ করা যেতে পারে এবং একই সঙ্গে ইভ্যালিকে বাঁচিয়ে রেখে ভবিষ্যতে সঠিক পথে ব্যবসার একটি সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। যদিও আমাদের মডেলটি অন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য হবে; তবুও বোঝার সুবিধার জন্য ইভ্যালির পরিপ্রেক্ষিতে এখানে সাতটি ধাপে মডেলটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

ধাপ-১: অনতিবিলম্বে ইভ্যালি এবং একই ধরনের অন্য কেসগুলোকে সমাধানের জন্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে যথাযথ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে অবশ্যই ই-কমার্স ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং এই খাতকে বোঝেন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, ই-কমার্সসহ প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসায়িক মডেলের প্রকৃত ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে জানেন, এমন বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এই কমিটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুবিধার্থে একই সঙ্গে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে কমিটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। শুধু ইভ্যালি নয়, বর্তমানে অনৈতিক ব্যবসায়িক মডেল ব্যবহার করে গ্রাহকদের ঠকানোর অভিযোগে অভিযুক্ত সব ই-কমার্স কেসগুলো নিয়ে কাজ করাই এই কমিটির কাজের আওতায় থাকবে।

ধাপ-২: যেহেতু ইভ্যালি আমদের প্রধান বিষয় এই মুহূর্তে, তাই এই কোম্পানিতে একজন তত্ত্বাবধায়ক বসানো যেতে পারে। মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির সহযোগিতা ও পরামর্শে ইভ্যালির সার্বিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্বে থেকে প্রতিদিনের কাজের তত্ত্বাবধান করবেন। ইভ্যালিতে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় পরিচালন ব্যয় সরকার নির্বাহ করবে। উল্লেখ্য, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারি কর্মকর্তা কিংবা পাবলিক সেক্টর থেকে হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই; অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাইভেট সেক্টর থেকেও দক্ষ এবং অভিজ্ঞ একজন এই ভূমিকা পালন করতে পারেন।

Owlspro এর প্রথম বর্ষ উদযাপন

Owlspro এর প্রথম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে গত ১০ই অক্টোবর ২০২১। অনুষ্ঠানটি ফেনী জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে Owlspro কোম্পানির সকল সদস্যসহ উপস্থিত ছিলেন SSC Group of industr এর চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন সোহাগ এবং অন্যন্য আমন্ত্রিত অতিথি।

গত ২০২০ সালের ১০ই অক্টোবর Owlspro agency প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাটা সদস্যসহ সর্বমোট ১৫ জন কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করে Owlspro. দীর্ঘ এক বছরের যাত্রায় Owlspro তাদের Brand কে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রায় ২৫টির বেশি কোম্পানির সাথে কাজ করেছে। ২০২১ সালের একই দিনে অর্থাৎ ১০ই অক্টোবর এ Owlspro তাদের Brand Re-design করে এবং নতুন লোগো উন্মোচন করে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় Owlspro এর সকল সার্ভিসগুলো তুলে ধরার লক্ষে প্রথমবারই Owlspro তাদের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ফেনীতে সম্পন্ন করে। গত ৯ই অক্টোবর ২০২১ তারিখের রাত ৯:৪০ এর চট্টগ্রামগামী ট্রেনে ৯ সদস্য বিশিষ্ট Owlspro টিম ফেনীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। প্রায় ৭ ঘন্টা সফরের পর ১০ই অক্টোবর ভোর ৫টায় তারা ফেনী পৌছায় এবং সেখানেই কিছুক্ষন বিশ্রাম

নিয়ে দুপুর ১২টায় Palki Restaurant & Party Center এ অনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান কেক কাটার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। কেক কাটার পর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা শুরু হয়ে। যেখানে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার হয় Owlspro এর উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য নিয়ে। সবার শেষে SSC Group of Industry এর চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন সোহাগ Owlspro এর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন এবং সর্বশেষে SSC Group of Industry কে সম্বর্ধনা প্রদান করে আনুষ্ঠানিকভাবে Owlspro এর প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

গত এক বৎসর ধরে Owlspro প্রায় ২৫টির বেশি দেশীয় ও বিদেশি কোম্পানির সাথে কাজ করার পাশাপাশি নতুন দুইটি কর্মক্ষেত্রে তৈরি করেছে যেখানে বাংলায় মনিষীদের জীবনী তথা ইতিহাসের প্রায় বিলুপ্ত সংস্কৃতিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যা বর্তমানে TechEdu360 নামে পরিচিত। অপরদিকে TechEdu360 কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে একটি বাংলা মাসিক ম্যাগাজিন যেখানে প্রতি মাসের প্রযুক্তি, শিক্ষা, চাকুরিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। যা বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যা নামে পরিচিত।

এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু নতুন উদ্ভাবনী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে Owlspro. যা বাংলাদেশের একটি বৃহৎ জনসংখ্যার কর্মসংস্থান এবং বেকারত্বরুধে কাজ করবে।

বাল্যবিবাহ হওয়া শিক্ষার্থীদেরও ক্লাসে ফেরানোর চেষ্টা

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, করোনার কারণে কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেখা গেছে, স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বাল্যবিবাহ বেশি হয়েছে। সেই জায়গায় চেষ্টা করা হচ্ছে বাল্যবিবাহ হয়ে যাওয়া মেয়েদের আবার ক্লাসে ফিরিয়ে আনতে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এ মুহূর্তে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের সংখ্যা বাড়াতে পারছি না। নতুন বছর শুরু হলে এবং তখন সংক্রমণ আরও কমে গেলে আশা করছি ক্লাসের সংখ্যা বাড়াতে পারব। এখন যে অবস্থা আছে, তাতে সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা যে পুরো-পুরি স্বস্তিতে আছেন, তা নয়। সে কারণে স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কোথাও কোথাও কম আছে। আস্তে আস্তে যখন সব ক্লাস শুরু হবে, তখন আবার তাদের উপস্থিতি বাড়বে, এটা নিশ্চিত।

করোনাকালে কিছু শিক্ষার্থী হয়তো ঝরে গেছে। করোনা অতিমারিতে কতটা আসলে

ঝরে গেছে এবং কী কারণে ঝরে গেছে, সেটা আমাদের নিরূপণ করতে হবে। সেটা নিয়ে আমরা এখনই কাজ করছি।'

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, কিছুদিন গেলে আমরা বুঝতে পারব, সত্যিকার অর্থে কতজন ঝরে পড়েছে। করোনা অতিমারির কারণে কিংবা ঋতু পরিবর্তনজনিত অসুস্থতার কারণে হয়তো ক্লাসে উপস্থিতির হার কম। আর কিছুদিন গেলে আমরা বুঝতে পারব, সত্যিকার কোন কারণে কতজন ক্লাসে আসছে না কিংবা কতজন আসলে ঝরে গেছে। তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে স্প্যাসিফিক ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে। আমরা এ বিষয়টি দেখছি।'

অনার্স শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এ সিদ্ধান্ত শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভর করে না, তাঁদের এমপিওভুক্তির বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তৃতীয় শিক্ষকের ব্যাপারে আমরা এ মুহূর্তে কোনো সুখবর দিতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে আমরা কাজ করছি।'

এ ছাড়া একই দিন বিকেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলরুমে কেক কাটা এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, উপাচার্য অধ্যাপক মো. মশিউর রহমান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও অংশ নেন। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ঢাবিতে দেড় বছর পর সশরীরে ক্লাস-পরীক্ষা ক্ষতি পোষানোর পরিকল্পনা

৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের (একাডেমিক কাউন্সিল) সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৭ অক্টোবর (আজ) থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীর ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হবে। সশরীর কার্যক্রম শুরুর পরও বিভাগ-ইনস্টিটিউটগুলো চাইলে অনলাইনে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ ক্লাস নিতে পারবে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের চিরচেনা ভিড় আজ দেখা যায়নি। সকালে কলাভবনের পরীক্ষাকেন্দ্রে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের একটি বর্ষের পরীক্ষা হয়। ক্লাস হয় বিজ্ঞান, কলা ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদসহ বিভিন্ন অনুষদের কয়েকটি বিভাগে। দর্শন বিভাগের একজন শিক্ষার্থী বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস হয়েছে। যাঁদের মাস্ক ছিল না, তাঁদের শ্রেণিকক্ষে মাস্ক দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শ্রেণীকক্ষের বাইরে হ্যান্ড স্যানিটাইজারও ছিল। দুটি সেকশনে ভাগ করে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। ৯টা থেকে ১০টা ও ১০টা থেকে ১১ টা এভাবে দুটি সেকশনে ভাগ করে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। দেড় বছর পর সবার সঙ্গে দেখা হলো, খুবই ভালো লেগেছে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একজন শিক্ষার্থী বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে দুই বছর ধরে একই বর্ষে আছি। নেটওয়ার্ক সমস্যাসহ নানা কারণে অনলাইনে আমাদের পরীক্ষা হয়নি। অনলাইনে যেখানে ক্লাসটাই ঠিকমতো করতে পারতাম না, সেখানে পরীক্ষাটা বিলাসিতাই ছিল। অনলাইন ক্লাস খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

ফিন্যান্স বিভাগের একজন শিক্ষার্থী বলেন, অনলাইনে ক্লাস হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা সফল হয়নি।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কে এম গোলাম রব্বানী প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে আজ প্রথম দিনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস-পরীক্ষা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীর পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় একাডেমিক কাউন্সিল প্রণীত 'ক্ষতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা' অনুসরণ করা হচ্ছে। পরীক্ষাসহ সেমিস্টার ৬ মাসের পরিবর্তে ৪ মাসে ও বার্ষিক কোর্স ১২ মাসের পরিবর্তে ৮ মাসে সম্পন্ন করা হবে। পাঠ্যসূচি কমানো হবে না, তবে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। প্রয়োজনে শনিবারও ক্লাস নেওয়ার অনুমতি রয়েছে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ ও শীতকালীন ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। ফল ঘোষণার ক্ষেত্রে সেমিস্টার পদ্ধতিতে ছয় সপ্তাহ ও বার্ষিক পদ্ধতিতে আট সপ্তাহের বেশি সময় নেওয়া যাবে না।

ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হলেন পঞ্চগড়ের সাকিব

পঞ্চগড় বিষ্ণুপ্রসাদ (বিপি) সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকার সেন্ট জোসেফ সেকেন্ডারি স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পেরিয়েছেন এ তরুণ। দুটিতেই ছিল জিপিএ-৫।

পঞ্চগড়ের ভারতীয় সীমান্তঘেঁষা প্রত্যন্ত গ্রাম শিংরোড়-রতনীবাড়ি এলাকায় তাঁর বাড়ি। কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কৃষক প্রশিক্ষক বাবা সোলেমান আলীর চার ছেলের মধ্যে নাজমুস সাকিব সবার ছোট।

কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটগুলোর ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধাতালিকায় প্রথম হন সাকিব। গত ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ১২ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষায় সাকিবের মোট স্কোর ছিল ২৯৫।

নাজমুস সাকিবদের কাছে অপেক্ষাও ছিল পরীক্ষার অংশ। প্রথমে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছেন। চলেছে প্রস্তুতির ভাঙা-গড়া। ভর্তি পরীক্ষা হবে কি হবে না, কবে হবে, কীভাবে হবে, এসব নিয়েও শঙ্কা ছিল অনেক। সব বাধা পেরিয়েই সরকারি-বেসরকারি ডেন্টাল

নাজমুস সাকিব বলছিলেন করোনাকালের দীর্ঘ অনিশ্চয়তার দিনগুলোর কথা। সাকিব বলেন, 'আমাদের কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় ছিল না। না আমরা কলেজের ছাত্র, না বিশ্ববিদ্যালয়ের। কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে অনলাইনে কোচিংয়ের মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলাম।'

চিকিৎসক হওয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। হোক সেটা মেডিকেলে বা ডেন্টালে। কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন তিনি? সাকিব বলেন, 'আমি মূল পাঠ্যবইকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। মূল বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো আন্ডারলাইন করে বারবার পড়তাম। এ ছাড়া কোচিংয়ের পরীক্ষাগুলো মিস করিনি। পরীক্ষায় যেসব উত্তর ভুল করতাম, পরের পরীক্ষায় সেগুলো আলাদা গুরুত্ব দিয়ে পড়তাম। আর মনটাকে সুস্থ রাখতে গ্রামের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতাম।'

ডেন্টালে ভর্তি হলেও মেডিকেলের প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। গত ২ এপ্রিল মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন পাঁচেক আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রস্তুতিটা ভালো হয়নি। অসুস্থতা নিয়েই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন সাকিব। কিন্তু দিন শেষে ফল আশানুরূপ হয়নি। তাই ডেন্টাল পরীক্ষার জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি নেন তিনি। দিন শেষে প্রস্তুতিটা কাজে এসেছে।

সাকিবের স্বপ্ন মানবিক চিকিৎসক হবেন। তিনি বলেন, 'ভালোভাবে পড়ালেখা শেষ করে চিকিৎসক হতে পারলে দেশের যে প্রান্তেই থাকি না কেন, মাসে অন্তত একবার হলেও গ্রামে ফিরে নিজের গ্রামের মানুষদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা দিতে চাই।' এদিকে নাজমুস সাকিবের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর গ্রামের পুরো মানুষ। এ জেলায় মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষায় দেশসেরা হওয়ার দৃষ্টান্ত এটাই প্রথম।

এ বছরও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হচ্ছে না

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার মতো এ বছরের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাও হচ্ছে না। এর পরিবর্তে বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে।

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নির্দেশনা চেয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সারসংক্ষেপ পাঠিয়েছিল, সেটি অনুমোদন হয়ে ফিরে এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে তিনি নাম প্রকাশ করতে চাননি।

এই পরীক্ষার বিষয়ে কিছুদিন আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন প্রথম আলোকে বলেছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে তাঁদের প্রস্তুতি আছে। কিন্তু ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য মাদ্রাসা গুলোর প্রস্তুতি নেই বলে তারা চায় পরীক্ষাটি না নেওয়া হোক। তাই পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি জানিয়েছিলেন, এ বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা হচ্ছে না। তখন তিনি এ বছরের প্রাথমিক ও

ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাও না হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

করোনা পরিস্থিতির কারণে গত বছরও এসব পরীক্ষা হয়নি। পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ওপরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়। তবে এবার ইতিমধ্যে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা এবং দশম শ্রেণির প্রাক্-নির্বাচনী পরীক্ষার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন প্রাথমিকেও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হতে যাচ্ছে।

এদিকে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেটের (জেএসসি) মতো কোনো পরীক্ষা রাখা হয়নি। নতুন শিক্ষাক্রম আগামী বছর পরীক্ষামূলকভাবে এবং পরের বছর (২০২৩) থেকে বাস্তবায়ন শুরু হবে। এ অবস্থায় শিক্ষাবিদসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এ দুই পরীক্ষা এখনই স্থায়ীভাবে বন্ধের ঘোষণা দেওয়া দরকার।

২০০৯ সাল থেকে পিইসি পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে সরকার। পরে মাদ্রাসার সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাও চালু করা হয়। প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী এসব পরীক্ষায় অংশ নেয়। আর ২০১০ সালে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা চালু হয়। এ পরীক্ষায় এখন মোট পরীক্ষার্থী ২৬ লাখের বেশি হয়।

কেন
ঘড়ির কাঁটা কেন ডান দিকে ঘোরে?
আব্দুল কাইয়ুম
আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারো, সব দেশে ঘড়ির কাঁটা কেন শুধু ডান দিকে ঘোরে? কোনো দেশে তো বাঁ দিকেও ঘুরতে পারত?
যেমন, আমাদের দেশে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে গাড়ি চলে, কিন্তু আমেরিকায় চলে ডান দিক দিয়ে।
স্যার যে কী বলেন! একেক দেশে একেক দিকে ঘড়ির কাঁটা ঘুরলে উল্টাপাল্টা লেগে যাবে না?
এমনকি বিভিন্ন দেশের এয়ারপোর্টে কেউ ঘড়ির সময় মেলাতে পারবে না, সবাই ফ্লাইট মিস করবে তো!
আচ্ছা স্যার, আপনিই বলুন তো ব্যাপারটা কী?
স্যার বলেন কী? কোন দেশে আবিষ্কার হলো, তার সঙ্গে ঘড়ির কাঁটার সম্পর্ক কী?
শোনো, আসল ব্যাপার হলো কী, ঘড়ি প্রথম আবিষ্কার হয় ইউরোপে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এ জন্যই ঘড়ির কাঁটা ডান দিকে ঘোরে!

জানো তো, ইউরোপ পৃথিবীর কোন অংশে? এটা উত্তর গোলার্ধে। সেখানে সূর্য দেখা যায় দক্ষিণ আকাশে। এটাই ছিল একটি বড় কারণ।
স্যার, ঠিক বুঝলাম না। সব আউলাইয়া যাইতাছে!
আরে এটা জটিল কিছু না। শোনো, কাঁটাযুক্ত ঘড়ি আবিষ্কারের আগে ছিল সূর্যঘড়ি। উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে দেখা যাবে সূর্য বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে।
সূর্যঘড়িতেও সময় নির্দেশক ছায়া বাঁ থেকে ডান দিকে যায়।
তাই কাঁটাযুক্ত ঘড়ি আবিষ্কারের সময়ও ঘড়ির কাঁটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘোরার নিয়ম অনুসরণ করা হলো। সেই নিয়মই অন্যান্য দেশ মেনে চলল।
ঘড়ি যদি দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম আবিষ্কার হতো, তাহলে হয়তো ঘড়ির কাঁটা ঘুরত ডান থেকে বাঁ দিকে। ঠিক উল্টা!

বিজ্ঞান কমিক কী ও কেন?

আমরা হাই তুলি কেন?

আব্দুল কাইয়ুম

আঁকা : সাদমান মুন্তাসির

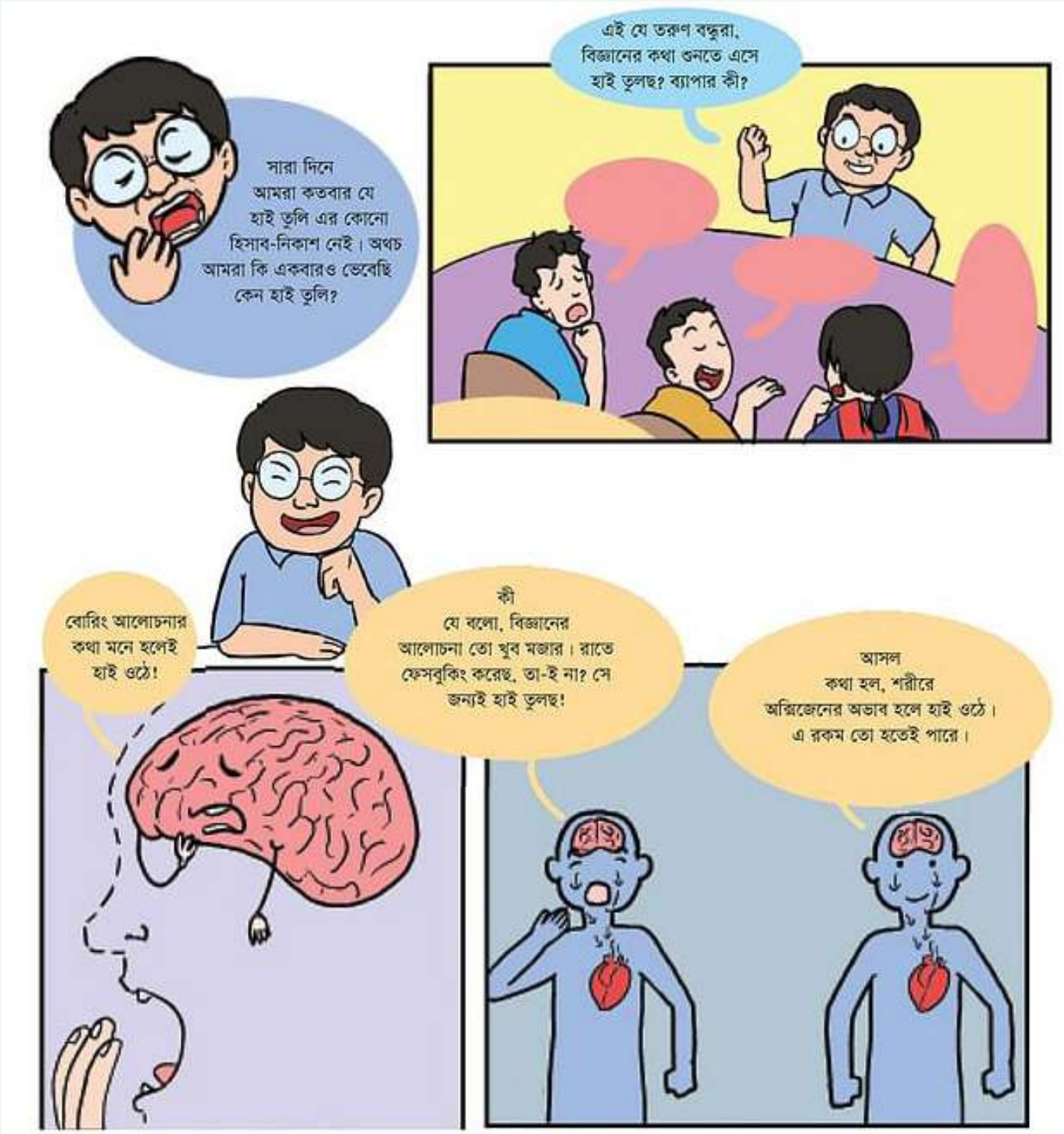

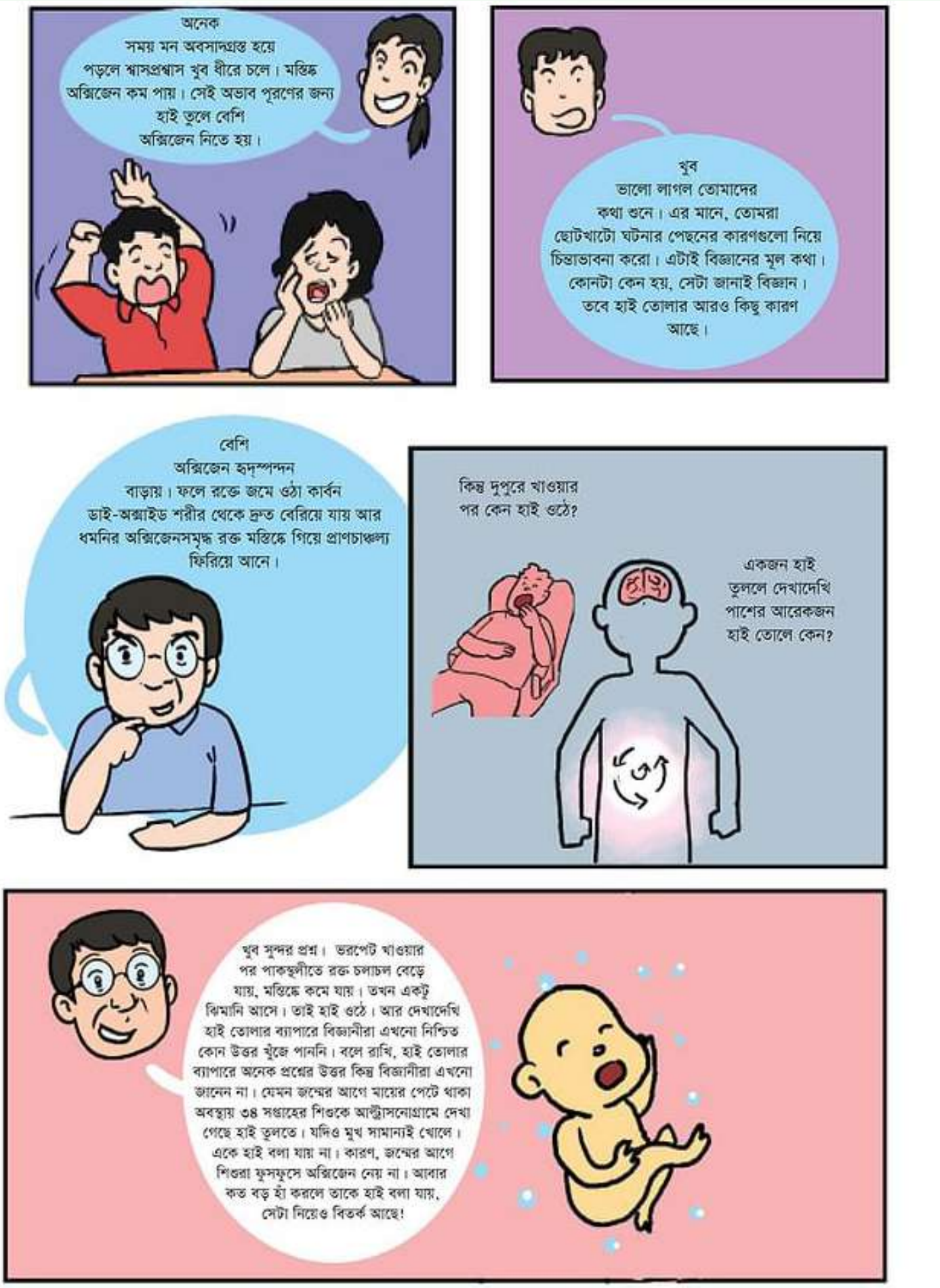
অনেক সময় মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে শ্বাসপ্রশ্বাস খুব ধীরে চলে। মস্তিষ্ক অক্সিজেন কম পায়। সেই অভাব পূরণের জন্য হাই তুলে বেশি অক্সিজেন নিতে হয়।
খুব ভালো লাগল তোমাদের কথা শুনে। এর মানে, তোমরা ছোটখাটো ঘটনার পেছনের কারণগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। এটাই বিজ্ঞানের মূল কথা। কোনটা কেন হয়, সেটা জানাই বিজ্ঞান। তবে হাই তোলার আরও কিছু কারণ আছে।
বেশি অক্সিজেন হৃদ্‌স্পন্দন বাড়ায়। ফলে রক্তে জমে ওঠা কার্বন ডাই-অক্সাইড শরীর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায় আর ধমনির অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত মস্তিষ্কে গিয়ে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনে।
কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর কেন হাই ওঠে?
একজন হাই তুললে দেখাদেখি পাশের আরেকজন হাই তোলে কেন?
খুব সুন্দর প্রশ্ন। ভরপেট খাওয়ার পর পাকস্থলীতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়, মস্তিষ্কে কমে যায়। তখন একটু ঝিমানি আসে। তাই হাই ওঠে। আর দেখাদেখি হাই তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত কোন উত্তর খুঁজে পাননি। বলে রাখি, হাই তোলার ব্যাপারে অনেক প্রশ্নের উত্তর কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না। যেমন জন্মের আগে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় ৩৪ সপ্তাহের শিশুকে আল্ট্রাসনোগ্রামে দেখা গেছে হাই তুলতে। যদিও মুখ সামান্যই খোলে। একে হাই বলা যায় না। কারণ, জন্মের আগে শিশুরা ফুসফুসে অক্সিজেন নেয় না। আবার কত বড় হাঁ করলে তাকে হাই বলা যায়, সেটা নিয়েও বিতর্ক আছে!

বিজ্ঞান কমিক কী ও কেন?

চাঁদ যদি চুরি হয়ে যায়

আব্দুল কাইয়ুম

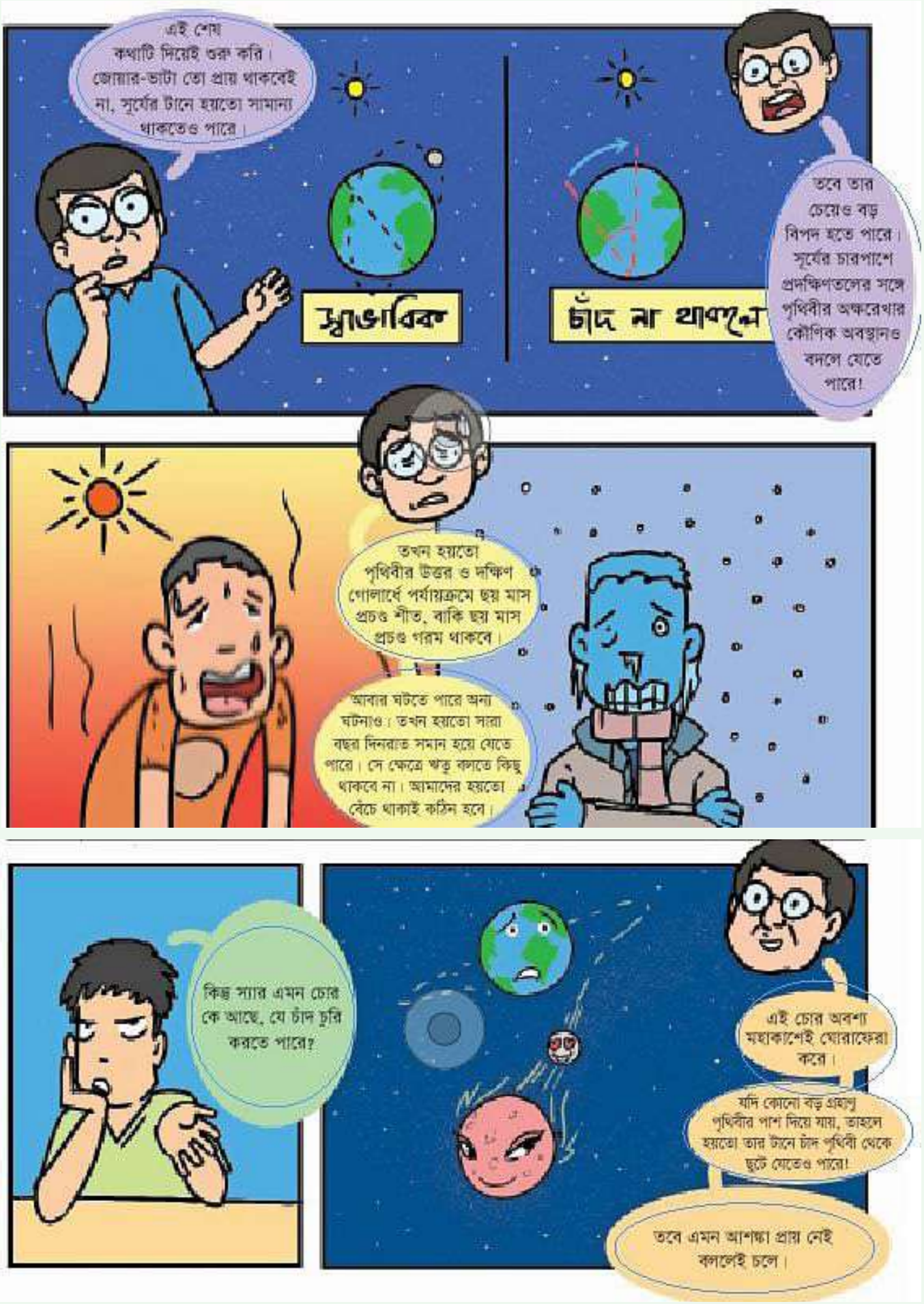
এই শেষ কথাটি দিয়েই শুরু করি। জোয়ার-ভাটা তো প্রায় থাকবেই না, সূর্যের টানে হয়তো সামান্য থাকতেও পারে।
স্বাভাবিক
চাঁদ না থাকলে
তবে তার চেয়েও বড় বিপদ হতে পারে। সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণতলের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখার কৌণিক অবস্থানও বদলে যেতে পারে!
তখন হয়তো পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে পর্যায়ক্রমে ছয় মাস প্রচণ্ড শীত, বাকি ছয় মাস প্রচণ্ড গরম থাকবে।
আবার ঘটতে পারে অন্য ঘটনাও। তখন হয়তো সারা বছর দিনরাত সমান হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঋতু বলতে কিছু থাকবে না। আমাদের হয়তো বেঁচে থাকাই কঠিন হবে।
কিন্তু স্যার এমন চোর কে আছে, যে চাঁদ চুরি করতে পারে?
এই চোর অবশ্য মহাকাশেই ঘোরাফেরা করে।
যদি কোনো বড় গ্রহাণু পৃথিবীর পাশ দিয়ে যায়, তাহলে হয়তো তার টানে চাঁদ পৃথিবী থেকে ছুটে যেতেও পারে!
তবে এমন আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে।

বিজ্ঞান কমিক
কী ও কেন?
আব্দুল কাইয়ুম
'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো' যায় কি?
ও, আচ্ছা। বলো তো, 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো'র প্রবাদটি কি সত্য? ওভাবে কি কাঁঠাল পাকানো যায়?
যায়, যায়। খুব যায়। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি!
আরে পাগল! এটা তো প্রবাদ, তা-ও বুঝিস না?
তোমরা মনে রাখবে, প্রবাদের পেছনেও কিছু সত্য থাকে। কাঁঠালের বোঁটার গোড়ায় লোহার শিকের গোঁজ দিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায়। সেখান থেকেই এই প্রবাদ।

ন কমিক
কী ও কেন?
আব্দুল কাইয়ুম
ডিম আগে না মুরগি আগে?

প্রশ্নটা অনেকের মাথা খারাপ করে দেয়। ভাবলাম একদিন তরুণদের ডেকে জিজ্ঞেস করি ওরা কী মনে করে
বলো তো, ডিম আগে না মুরগি আগে?
ডিম!
মুরগি!
ডিম!
স্যার ডিম ছাড়া বাচ্চা হবে কীভাবে? ডিম তো আগে হতেই হবে!
আরে কী বোকা, ডিমটা পাড়ল কে? মুরগি না থাকলে ডিম আসে কীভাবে?
হুম, দেখছি তোমাদের মধ্যে ভাগটা প্রায় সমান সমান। বলো তো তোমাদের যুক্তি কী?

থামো, থামো। এখানে বিজ্ঞানটা আগে বুঝতে হবে। প্রথমে বুঝতে হবে ডিম কী?
মুরগির ডিম হলো মোরগের শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত ডিম্বাণু (জাইগোট)। এটাই মুরগির বাচ্চার আদি বা প্রথম কোষ। প্রয়োজনীয় তাপে এই কোষ বিভাজিত হয়ে মুরগির বাচ্চা তৈরি হয়।
কিন্তু ডিম পেড়েছে যে মুরগিটা, সেটা এসেছে বহু বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।
তার মানে, মুরগিটি এসেছে আরেকটি মুরগির ডিম থেকে, সেটি এসেছিল আরেকটি মুরগি থেকে, তার জন্ম হয়েছিল আরেকটি ডিম থেকে...এইভাবে পেছনে যেতে থাকলে কী পাব?
দেখা যাবে, আদি ডিমটি এসেছিল একেবারে পুরোপুরি মুরগি থেকে নয়, মুরগি প্রজাতির কাছাকাছি, প্রায় মুরগি ধরনের কোনো প্রাণী থেকে। এর ডিএনএতে ছিল একটি পুরোপুরি মুরগির গুণাবলি।
তবে মনে রাখতে হবে, হঠাৎ করে একদিন ডিম থেকে মুরগি আসেনি, এসেছে দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। সুনির্দিষ্টভাবে ডিম আগে বললে সঠিক হবে না। বিবর্তনের ধারায় যে ডিমে মুরগির সব ডিএনএ ছিল তার থেকে মুরগির জন্ম। সেই ডিমটি এসেছিল যে প্রাণী থেকে, সেটাও প্রায় মুরগিই বলা যায়। তাই আগে মুরগি, তারপর ডিম বললেও খুব ভুল হবে না!
তাই বলতে হয়, আগে এসেছিল ডিম, তারপর মুরগি!

আমি ঠিক, ডিম আগে!
না, না আমি ঠিক, মুরগি আগে!

মশা কেন কামড়ায়?

চিকুনগুনিয়া রোগের মহামারি দেখা দিয়েছে। মশা দায়ী, সবাই জানে। কিন্তু তরুণেরা মশার ব্যাপারে কতটা জানে? দেখা যাক ওরা কী ভাবছে।
বলো তো মশা কেন কামড়ায়?
মশার কাজই তো কামড়ানো। না হলে তাদের হুল আছে কেন?
আরে সে তো সবাই জানে, আসলে রক্তের গন্ধে ওরা ছুটে এসে হুল ফোটায়।
আমরা মশা মারতে কামান দাগি তো, তাই শিক্ষা দিতে আমাদের আচ্ছাসে কামড়ায়!
শোনো, মনে রাখবা, শুধু মেয়ে মশারাই কামড়ায়। ডিম পাড়ার আগে তাদের পুষ্টি দরকার। রক্তে প্রচুর পুষ্টি।
একটা মেয়ে মশা তার শরীরের ওজনের কয়েক গুণ বেশি রক্ত শুষে নেয়, তারপরই সে ছুট ডিম পাড়তে।

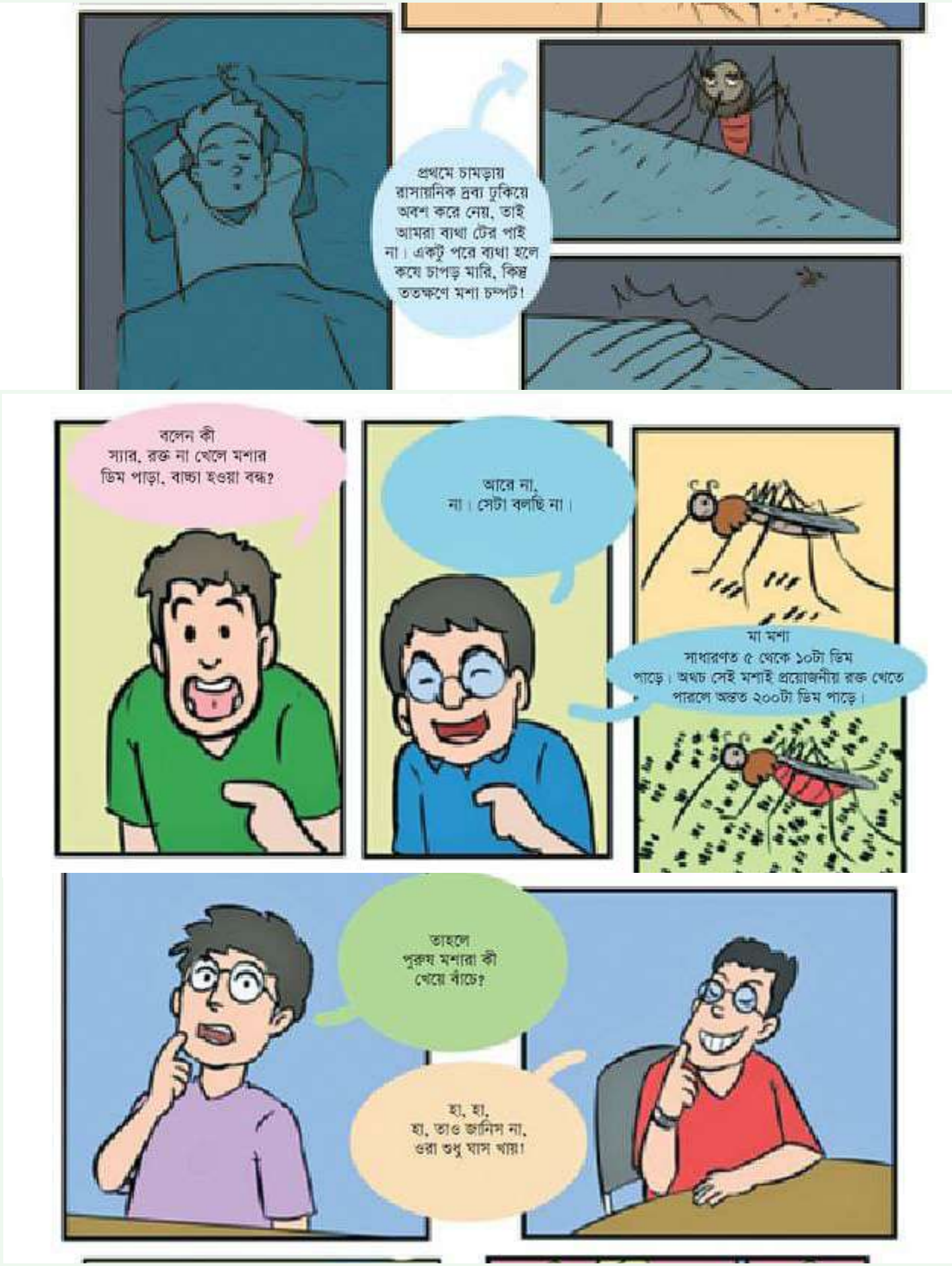
প্রথমে চামড়ায় রাসায়নিক দ্রব্য ঢুকিয়ে অবশ করে নেয়, তাই আমরা ব্যথা টের পাই না। একটু পরে ব্যথা হলে কষে চাপড় মারি, কিন্তু ততক্ষণে মশা চম্পট!
বলেন কী স্যার, রক্ত না খেলে মশার ডিম পাড়া, বাচ্চা হওয়া বন্ধ?
আরে না, না। সেটা বলছি না।
মা মশা সাধারণত ৫ থেকে ১০টা ডিম পাড়ে। অথচ সেই মশাই প্রয়োজনীয় রক্ত খেতে পারলে অন্তত ২০০টা ডিম পাড়ে।
তাহলে পুরুষ মশারা কী খেয়ে বাঁচে?
হা, হা, হা, তাও জানিস না, ওরা শুধু ঘাস খায়!

ঠিক তাই। পুরুষ মশারা চাইলেও রক্ত খেতে পারে না।
কারণ তাদের হুল ও মুখ বেশ নরম, হুল ফোটানোর সাধ্য নেই।
শুধু লতাপাতা ও ফুলে হুল ফুটিয়ে রস ও মধু খেয়ে ওরা বাঁচে!

শীতের সেই সব সকাল

আলস্যের চাদর অবমুক্ত করে কুয়াশার ধূম্রজাল চিরে পুর্ব আকাশে সূর্য নিজেকে জানান দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কোমল সূর্যরশ্মিতে ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলো মুক্তোদানার মতো ঝলমল করে। গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ আর পাখিদের কলরব আন্দোলিত করে গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে। কী স্নিগ্ধময় গ্রামবাংলার শীতের সকাল!

এক শীতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাই। পুবের জানালা চিরে সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠি। কিন্তু কনকনে শীতের কারণে লেপ মুড়ি দিয়ে বসে আছি। হঠাৎ হিমেল বাতাসে ভেসে আসা মিষ্টি গন্ধ আমাকে মুগ্ধ করে। কৌতূহল নিয়ে বাইরে এসে দেখি উনুনে খেজুর রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে শীতের নানা পিঠাপুলি।

শিশিরভেজা মেঠো পথে একদল শিশু খালি পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গী হলাম। কিছুটা পথ এগোতেই চোখ দুটি জুড়িয়ে গেল সরিষাখেত দেখে। যেন হলুদের চাদর বিছিয়ে রাখা হয়েছে খোলা আকাশের নিচে। কী অপরূপ প্রকৃতি!

ছোটবেলায় খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলাম। ফলে শীতের প্রভাব আমাকে খুব একটা বিচলিত

করতে পারেনি। শহরে ইট-কাঠ-পাথরের দেয়াল আর অহরহ গাড়ির অবিরাম ছুটোছুটিতে শীতের প্রভাবটা গ্রামের তুলনায় একটু কম অনুভূত হয়। আধুনিক প্রতিযোগিতার যুগে জীবনগাড়িকে সচল রাখতেই শহুরে যান্ত্রিক ছুটে চলা। কিন্তু শহরের তুলনামূলক কম শীতকে উপেক্ষা করে গ্রামের হাড়কাঁপানো শীত অনেক বেশি উপভোগ্য। শীত এলেই মনে পড়ে ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা। গ্রামের সেই শীতের সকাল আজও হৃদয়কে টানে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে প্রকৃতির খুব কাছে।

পাহাড়ে শীতের সকাল

কুয়াশার চাদর ভেদ করছে সূর্যের রশ্মি। জুম চাষে যাচ্ছে দুই কিশোরী। বাংলা ঋতুতে হেমন্ত হলেও পাহাড়ে এখন শীতের আমেজ। ছবিটি সোমবার খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থেকে তুলেছেন **সমির মল্লিক**

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা

শীত এলেই বাঙালির মনে পড়ে শীতের পিঠার কথা। পিঠা ছাড়া বাংলার শীত যেন পরিপূর্ণ হয় না। ঐতিহ্যবাহী শীতের বাহারি পিঠা খাওয়ার রীতি বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির অংশ। একসময় পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় ছোট-বড় সকলেই পিঠা খাওয়ার আনন্দে মেতে উঠতো। কিন্তু এখন তা আর চোখে পড়েনা। কর্মচাঞ্চল্য এই ব্যস্ড়ময় জীবনে তা এখন অনেকটাই হারিয়ে গেছে বা যাওয়ার পথে।

যতই শীত বাড়তো ততোই যেন মানুষের পিঠা বানানোর ব্যস্ড়তা বেড়েই চলতো। প্রতিটি ঘরে ঘরে রকমারি পিঠা তৈরির উৎসবে মেতে উঠতো গৃহস্থ বাড়ির গৃহিনীরা। এ সময় শিশু-কিশোররা হতো আনন্দে আত্নহারা। তৈরি পিঠার একটা অংশ পাঠানো হতো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও।

অথচ শীতের পিঠা বানানোর ধুমধাম আয়োজন পাড়া-গাঁয়ে কিংবা কৃষকপল্লীতে আর চোখে পড়ে না। আত্মীয়-স্বজন আছে

আগের মতোই, নেই শুধু মধুর সম্পর্ক। মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেলেও কমেনি মনের সংকীর্ণতা। সবাই যেন আত্মকেন্দ্রিক, কেউ কারও খোঁজ রাখতে চায় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা, বদলে যাচ্ছে রুচি। হারিয়ে যাচ্ছে পিঠা তৈরির সেসব উৎসবমুখর আমেজ।

নবান্ন ও শীতের পিঠা

এক সময় আমন ধান কাটার পরই শুরু হতো নবান্ন উৎসব। নতুন ধানের নতুন পিঠা, পোলাও, পায়েস, ক্ষীর এবং রকমারি খাবার তৈরি করা হতো কৃষকের ঘরে ঘরে। প্রতিটি পাড়া-মহল্লা এবং বাড়ি বাড়ি নতুন চাল রান্নার মৌ মৌ ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ত, খেতেও বেশ লাগত। ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব উপলক্ষে গ্রামগঞ্জের কৃষক পরিবারের ঝি-জামাই এবং আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত করে নতুন চালের বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি করে ভূরিভোজের আয়োজন করা হতো। তারাও নবান্ন উৎসবের দাওয়াত পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। তবে, বর্তমান সময়ে অগ্রহায়ণ-পৌষের নবান্নের উৎসব কৃষকপাড়ায় খুব একটা দেখা না গেলেও শীতে পিঠা খাওয়ার পুরনো অভ্যাস বদলাতে পারেনি এখনো গ্রামীণ জনপদের মানুষ।

শীতের সাথে পিঠার যোগসূত্র

পিঠা বাঙালির প্রিয় খাবার। এ দেশে এমন মানুষ কমই আছে, যারা পিঠা পছন্দ করেন না। পিঠা নিত্যদিনের খাবার না হলেও শীতকালে বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠার ব্যাপক কদর রয়েছে। উৎসব আয়োজনেই পিঠা নামের বাড়তি খাবার তৈরি করা হয়। আগে শীতের শুরুতেই গ্রামগঞ্জের ঘরে ঘরে পৌষ পার্বনের রকমারী পিঠার আয়োজন করা হত। দাদী-নানী, মা, খালারা পরম মমতায় তৈরি করতো বিভিন্ন ধরনের রসালো পিঠা। নতুন আতব চালে তৈরি হয় পিঠা।

এক সময় সন্ধ্যা হলেই গ্রামে চাল গুঁড়া করার শব্দে মুখরিত হতো চারদিক। রাতভর চলতো পিঠা তৈরির কাজ। অনেকে আবার পিঠা তৈরির সময় গীত গেয়ে রাত পার করতেন। পিঠার অন্যতম উপাদান চালের গুঁড়ো হলেও এর সঙ্গে লাগে গুড়, ক্ষীরসহ নানা উপকরণ। এ উপকরণের সঙ্গে শীতের একটা যোগসূত্র আছে। তাই হেমন্ত থেকে শীতকাল পর্যন্ত পিঠা তৈরির ধুম পড়ে।

পিঠাপুলি ও শহুরে বাঙালির উৎসব

পিঠা-পুলির দেশ বাংলাদেশ। তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পিঠার স্থান যেন দেশীয় ঐতিহ্যের স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলে। পিঠা ধরে রাখছে আত্মীয়তার বন্ধনও। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি পিঠা পাঠানোর রীতি পালন হয়ে আসছে বহুকাল ধরে।

আজকের ব্যস্ত জীবনে শহরের ইট-কাঠের খাঁচায় আর সেই গ্রামের মেঠোপথ ধরে ঝাপসা কুয়াশায় পাওয়া যায় না সকালের খেজুরের রস। সূর্যের কোমল মিষ্টি রোদের হাসিতে খাওয়া হয় না রসের পিঠা। তবে নাড়ির টান যে আজও অনুভূত হয় সংস্কৃতির তরে। তাই শহরবাসীর পিঠার চাহিদা মেটাতে অলিতে গলিতে, রাস্ড়ার মোড়ে, বাসস্ট্যান্ড ও বাজারে বসেছে ছোট ছোট পিঠার দোকান।

এছাড়াও প্রতিবছরই শীতের মৌসুমে ঢাকাসহ প্রায় সব জেলা শহরগুলোতেও বিভিন্ন পিঠা উৎসবে মুখরিত হয় অনেকেই। গলির মোড় থেকে পিঠা উৎসব এভাবেই শহরবাসী শীতের পিঠার স্বাদ নেয়।

পিঠার স্বাদ ও নামের বিশেষত্ব

প্রতিটি পিঠা শুধু স্বাদেই অনন্য নয়, এদের এক একটি উপকরণে পরম মায়ার পরশ মাখা থাকে। গাঁয়ের কিশোরী মেয়ে বা লাজুক বধূর আলতা রাঙা পায়ে ঢেঁকি ভাঙানির গান এনে দেয় ধবধবে চালের গুঁড়া। শীতের আদুরে রোদে উঠোনের এক কোণে দুই-তিনজনের গল্পে গল্পে নারকেল কুড়ানো, কুয়াশা চাদর ভোরে জোগাড় করা খেজুর রস, সেই নতুন রসের থেকে তৈরি পাটালি গুড় আর খাঁটি ঘন দুধ, তেল ইত্যাদি সব উপকরণের সাথে মায়ের যত্ন আর ভালোবাসা যোগ হলেই মনকাড়া, নজরকাড়া অমৃত স্বাদের পিঠা পুলি জিভে জল আনে।

বেশিরভাগ পিঠা মিষ্টি হলেও স্বাদ কিন্তু একরকম নয়। এদের কোনটা রেখে কোনটা বেশি মজাদার তা বলা কঠিন। বলতে পারেন পিঠা পুলিও যেন তাদের নিজেদের মধ্যে স্বাদের প্রতিযোগিতা করে। শুধু স্বাদই নয়, নামেও এদের বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন- গরম ভাপে তৈরি ভাপা পিঠা, সুন্দর নকশা আঁকা হয় বলে নকশী পিঠা, দুধে ভিজে চিতই হয় দুধ চিতই, লবঙ্গের ঘ্রানে সাজে লবঙ্গ লতিকা, মুঠ পাকিয়ে সেদ্ধ দিলেই মুঠোপিঠা। আবার গোলাপ ফুলের আকারে হল গোলাপ পিঠা। এছাড়াও মুখে রোচে পাটিসাপটা, কুলি, দুধ কুলি, চিতই, বিয়ের বিশেষ বিবিয়ানা, মেরা পিঠাসহ আরও কত কী!

যত রকম পিঠা

পিঠাবিহীন শীতকাল যেন কল্পনাই করা যায় না। তাই শীতকালকে পিঠার মৌসুমও বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে বাঙালির লোক ইতিহাস-ঐতিহ্যে পিঠাপুলি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে কত রকম পিঠা হয় তা বলে শেষ করা কঠিন।

তবে পিঠাপুলির প্রায় ১৫০টি রকমভেদ থাকলেও বর্তমানে কিছু প্রচলিত বিভিন্ন পিঠার তালিকা দেওয়া হলো- সবজি কুলি, পুলি পিঠা, তারা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, নারু পিঠা, পায়েস পিঠা, সুজি পিঠা, সেমাই পিঠা, ভাঁপা পিঠা, নৌকা পিঠা, পয়সা পিঠা, নুডুলস পিঠা, কাঁটা পিঠা, ম্যারা পিঠা, বেনী পিঠা, তালের পিঠা, ক্লিপ পিঠা, কলা পিঠা, শামুক পিঠা, ফুলকপি পিঠা, আঙ্গুরী পিঠা, চপ পিঠা, গজা পিঠা, টক পিঠা, বৈশাখী পিঠা, সেমায় বরফি, পাক্কন পিঠা, চিতই পিঠা, স্পেশাল নক্সা পিঠা, ডোনাট পিঠা, শিমফুল

পিঠা, নকশি পিঠা (ঝাল), ঝুড়ি পিঠা, নকশি পিঠা (মিষ্টি), গোলাপ ফুল পিঠা, মসলা পিঠা, বস্ড়া পিঠা, তেজপাতা পিঠা, লবঙ্গ পিঠা, পাকান পিঠা, পাকড়া পিঠা, তেলে ভাজা পিঠা, ডিমের ঝাল পিঠা, দুধ চিতই পিঠা, ঝাল মসলা পিঠা, দুধ পুলি পিঠা, চকলেট পিঠা, সংসারী পিঠা, বিস্কিট পিঠা, পুলি পিঠা (ভাঁপা) ও মালাই পিঠা ইত্যাদি।

শীতের সেরা পিঠা ও খেজুরের রস

খেজুরের রসে তৈরি নানা প্রকার পিঠা-পায়েস গ্রাম-বাংলার মানুষের নবান্নের সেরা উপহার। খেজুরের রস দিয়ে তৈরি করা হতো পাটালিগুঁড়, মিঠাইসহ নানা রকমের মজার মজার খাবার। প্রতি বাড়িতে সকালবেলা খেজুরের রসে ভেজানো পিঠা খাওয়ার ধুম পরতো। নিজের বাড়ির সদস্য ছাড়াও জামাই-ঝি, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী সবাই মিলে এক আসরে মেতে উঠতো পিঠা খাওয়ার মহোৎসবে। পিঠা আর খেজুরের রস একটি আরেকটির পরিপূরক যা বাঙালির নাড়ির সাথে জড়িয়ে আছে।

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিগুলো একে একে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের গৃহিণীদের মধ্যে আগের মত পিঠা বানানোর উৎসব নেই। আমাদের নতুন প্রজন্ম থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পিঠা। এখন পিঠা বানানোটা অনেকটা স্মৃতি হয়ে গেছে। আগের সেই পিঠা বানানোর দিনগুলো হারিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই।

শীত মৌসুমে নিজ নিজ বাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে বা মাঝে মাঝে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা গেলে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব কিংবা শীতের পিঠা ফিরে পাবে তার হারানো গৌরব।

শীতের গ্রাম বাংলা

শীতকালে বেড়ানোর সুযোগ পেলে অনেকেই বেছে নেন পাহাড় বা সমুদ্রকে। কিন্তু শহুরে জীবনে অভ্যস্ত মানুষ প্রকৃতির কাছে খুব একটা যান না। তাই শীতে প্রকৃতি উপভোগ করতে ঘুরে আসতে পারেন বাংলার কিছু গ্রাম থেকে।

চারপাশে কুয়াশার ধূম্রজাল। সকালে প্রায়ই কুয়াশার চাদরে ঢেকে থাকে গ্রাম বাংলার প্রতিটি প্রান্ত আলস্যের চাদর মুক্ত করে কুয়াশার ধূম্রজাল চিরে পূর্ব আকাশে সূর্য নিজেকে জানান দেওয়ার কাজে ব্যস্ত।

মিষ্টি সূর্যরশ্মিতে ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলো মুক্তোর মতো ঝলমল করে।

শিশির ভেজা সরিষার সবুজ গাছে শীতের সোনাঝরা রোদে যেন ঝিকিমিকি করছে। এ যেন এক অপরুপ দৃশ্য। দেখে যেন মনে হয় প্রকৃতি কন্যা সেজেছে গায়ে হলুদ বরণ সেজে।

কনকনে শীতের মধ্যেও থেমে নেই শ্রমিকদের কাজ। তক্তা বিছিয়ে নৌকা থেকে পণ্য ওঠানো-নামানো করছেন শ্রমিকেরা।

মখমলের মতো নরম ঘাসগুলো শিশিরে ভিজে থাকে সামান্য সময়ের জন্য। বুনোফুলগুলো অপরূপ হয়ে ওঠে আবার সকালের মিঠে রোদে হারিয়ে যায় সবকিছুকে অপরূপ করা সেই অভিমানী শিশির।

ইতিহাস

শেরে বাংলার মাতৃলালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

শেরে বাংলারা নানার নামঃ আহম্মদ বকস মিঞা।
শেখ আহম্মদ বকস মিঞার ওয়ারিশ নিম্নরুপঃ

এক পূত্র ও ২ দুই কন্যা যেমনঃ
১। আব্দুল হামেদ মিঞা। (শেরে বাংলার মামা)
২। সৈয়াদানুন্নেছা খাতুন (শেরে বাংলার মাতা)
৩। আজিজুন নেছা খাতুন। (শেরে বাংলার খালা)

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৯ অক্টোবর বরিশাল জেলার বানরীপাড়া থানার চাখার গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়াজেদ আলী সাহেব ছিলেন বরিশালের খ্যাতনামা আইনজীবীদের অন্যতম। বিপুল ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান হলেও ফজলুল হক বাল্যকাল থেকেই বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন। তেমনি শৃঙ্খলা ও আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করেই গড়ে তোলা হয়েছিল তাঁকে।

শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাল্যকাল থেকেই তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরেই তাঁর আরবী, ফারসি ও উর্দু শিক্ষা শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং পরিতোষিকসহ ঢাকা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ. এ এবং পরে রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও গণিতে অনার্সসহ বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ সালে অঙ্কে এম. এ. পাস করেন। বরিশালের রামচন্দ্র কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর ১৮৯৭ সালে তিনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপরই তিনি পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী রূপে ১৯০০ সালে কলকাতা হাই কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

১৯০৬ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্টেটের চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু তেজস্বী হক সাহেব সরকারের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯১১ সালে চাকরি ছেড়ে আবার আইন ব্যবসায়ে নেমে পড়েন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিন ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে তিনি অংশ নেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মন্টেগু-চেমসফোর্ট কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে লীগ কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে তিনি যে প্রস্তাবিত উত্থাপন করেন, তাই বিখ্যাত 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে অভিহিত হয়।

১৯১৮ সালে ফজলুল হক লিখিত ভারত মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে সভাপতি হিসেবে তাঁর দেওয়া ভাষণ ইতিহাসের এক স্বর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়েছে। ১৯২৫ সালে তিনি বাংলার মন্ত্রী সভার সদস্য মনোনীত হন।১৯২৭ সালে তিনি

কৃষক-প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩১-৩২ সালে তিনি বিলেতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বক্তৃতা সবার মনে সাড়া জাগায়। ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তিনিই ছিলেন এ পদে অধিষ্ঠিত প্রথম বাঙালি মুসলমান।

১৯৩৭ সালে শের-এ-বাংলা এ. কে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে পাঞ্জাববাসীরা তাঁকে উপাধি দেয়। শের-ই-বঙ্গাল অর্থাৎ বাংলার বাঘ। সে থেকে তিনি শের-ই-বাংলা নামেই পরিচিত। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পযন্ত দীর্ঘকালের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। এ সময়ে তিনি 'ঋণ সালিশী বোর্ড' গঠন করেন। এর ফলে দরিদ্র চাষীরা সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়।পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ১৯৫২ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে তিনি 'যুক্তফ্রন্ট' দলের নেতৃত্ব দিয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পযন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর-অব-ল এবং ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁকে 'হিলাল-ই-পাকিস্তান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এদেশের সাধারণ মানুষের জন্যে যা করেছেন, অন্য কোন জনদরদী নেতার পক্ষে এ যাবৎ তা সম্ভব হয়নি। এদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্যে তিনিই সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সাধনা ছিল তাঁর আজীবনের। তাঁরই প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, তাঁর চাখারে ফজলুল হক কলেজ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কৃষকপ্রজা আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ সালিশী বোর্ড প্রবর্তনের জন্যে তিনি বাংলার দারিদ্র্য-নিপীড়িত কৃষক সমাজের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।ব্যক্তিগত দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হাতেম তাই। তাঁর গোপন দানে কত দুঃস্থ কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, কত ছাত্র পরীক্ষার ফি দিয়ে নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিয়েছে, তাঁর দানে যে কত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কত পীড়িতের দুঃখমোচন হয়েছে তার হিসেব নেই। তাঁর জীবনে আরও যে কত সৎগুণের সমাবেশ ঘটেছিল, ইতিহাসও তার সব খবর রাখেনি।

বাংলার নয়নমণি শের-এ-বাংলা এ. কে ফজলুল হক ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল প্রায় ৮৯ বছর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। এ প্রবীণ জনদরদী নেতার মৃত্যু সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে সারা বাংলায় নেমে আসে শোকের ছায়া, শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে সমগ্র দেশবাসী। ঢাকার পুরানো হাইকোর্টের পাশে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।ফজলুল হক আমাদের মাঝে বেঁচে নেই; কিন্তু বাঙালি সমাজ যত দিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তাদের হৃদয়ে ফজলুল হক চিরজীবী।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতি বুঝিনে। ওসব দিয়ে আমি ফজলুল হককে বিচার করিনে। আমি তাঁকে বিচার করি গোঁটা দেশ ও জাতির স্বার্থ দিয়ে। একমাত্র ফজলুল হকই বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে বাঁচাতে পারে। সে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সাচ্চা মুসলমান। খাঁটি বাঙালিত্ব ও সাচ্চা মুসলমানিত্বের এমন সমন্বয় আমি আর দেখিনি।'

মুহাম্মদ আল ফাতেহ কনস্টানটিনোপল জয় করেছিলেন এবং আব্বাসি, আইউবি এবং মামলুক বংশের পতনের পর বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যকে শাসন করেছিলেন। উসমানি সাম্রাজ্যের সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বিনীত মুসলিম এবং একনিষ্ঠ আল্লাহভক্ত। দুঃসাহসী ও মহান বীরযোদ্ধা মুহাম্মদ আল ফাতেহ হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজয়ী নেতা ছিলেন।

মুহাম্মদ আল ফাতেহর পুরো নাম সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ বিন দ্বিতীয় মুরাদ। জন্ম ১৪২৯ সালের ২০ এপ্রিল এবং মৃত্যু ১৪৮১ সালের ৩ মে। তিনি ছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের সপ্তম সুলতান। আল ফাতেহ (বিজয়ী) এবং আবুল খায়রাত (কল্যাণের পিতা) তার উপাধি। কারণ তিনি প্রায় তিরিশ বছর মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের উৎস ছিলেন। ১৪৫১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি উসমানি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। কিন্তু ব্যক্তিত্ববোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সততা ও নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অসাধারণ।

তার পূর্বসূরি কয়েকজন খলিফা কনস্টানটিনোপল জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনোভাবে সফলতা অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু মুহাম্মদ আল ফাতেহ অত্যন্ত

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করেন। তিনি কনস্টানটিনোপল জয় করার জন্য আড়াই লাখ মুজাহিদের বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং ১৪০টি যুদ্ধজাহাজের সমন্বয়ে বিশেষ নৌবহর প্রস্তুত করেন। অবশেষে তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে একমাত্র বিরল ও বিস্ময়কর স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যুদ্ধজাহাজ গুলোকে ১০ মাইল স্থলপথ অতিক্রম করানোর পর গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করাবেন। বসফরাস প্রণালীর পশ্চিম তীর থেকে জাহাজ স্থল এলাকায় তুলে নিয়ে একটি ঘুরাপথে গোল্ডেন হর্নের দক্ষিণ তীরে পৌঁছাবেন (এ স্থানটিকে বর্তমানে কাসেমপাশা বলা হয়)। সেখান থেকে জাহাজগুলোকে গোল্ডেন হর্নে নামিয়ে দেবেন। সেই দীর্ঘ দশ মাইল স্থলপথটি ছিল অসমতল, পাহাড়ি ও বন্ধুর। মুহাম্মদ ফাতেহর দৃঢ় সংকল্প ও বিস্ময়কর কর্মদক্ষতায় মাত্র এক রাতের মধ্যে তার সিদ্ধান্ড়কে বাস্ড়বায়ন করে দেখান। প্রথমে তিনি সেই স্থলপথে কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেন। চর্বি ঘষে ঘষে তক্তাগুলো পিচ্ছিল করেন। তারপর দেখতে জাহাজের মতো সত্তরটি নৌকা বসফরাস প্রণালি থেকে ওপরে তুলে কাঠের পিচ্ছিল তক্তায় উঠিয়ে দেন। প্রতিটি নৌকায় দুজন করে মাল্লা ছিল। বাতাসের সাহায্য পাওয়ার জন্য পাল উড়িয়ে দেয়া হয়। মানুষ ও বলদ মিলে নৌকাগুলোকে টেনে দীর্ঘ দশ মাইল পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে গোল্ডেন হর্নে পৌঁছে দেয়। সত্তরটি নৌকার এ মিছিল সারারাত মশালের আলোয় পথ পাড়ি দেয়। বাইজানটাইনের সৈন্যরা কনস্টানটিনোপলের প্রাচীর থেকে বসফরাস প্রণালির পশ্চিম তীরে মশালের আলোর দৌড়াদৌড়ি লক্ষ করে। কিন্তু অন্ধকারের কারণে সেখানে কী হচ্ছে তার কিছুই তারা বুঝে উঠতে পারে না। অবশেষে ভোরের আলো যখন রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে দেয়, ততক্ষণে সুলতান মুহাম্মদের সত্তরটি নৌকা ও ভারি তোপটি গোল্ডেন হর্নের উপরাংশে পৌঁছে গেছে।

স্থলপথে জাহাজ চালানোর এ অভূতপূর্ব কৃতিত্ব, যা এর আগে কারও কল্পনায়ও আসেনি।

এটা এতটাই বিস্ময়কর ঘটনা ছিল যে, পাশ্চাত্যের কট্টরপন্থী ঐতিহাসিকরাও এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেননি। এডওয়ার্ড গিবনের মতো ঐতিহাসিকও এটিকে দৈব ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ফাতেহ চূড়ান্ত আক্রমণের সফলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। মুসলিম সেনাবাহিনী ৮৫৭ হিজরির ২০ জমাদিউল উলা রাতটি জিকির-আজকার, তসবি ও দোয়ার মধ্যে কাটিয়ে দেন। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মুহাম্মদ ফাতেহ বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ, আমরা আয়া সোফিয়ার গির্জায় জোহরের নামাজ আদায় করব। তবে সেন্ট রোমানস ফটকের ওপর (বর্তমানে এটিকে তোপকাপি বলা হয়) কঠিন আঘাত হানা হয়। দুপুর পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মধ্যে ভীষণ আগুন ঝরানো ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। বাইজানটাইন বাহিনীও সেদিন অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। দুপুর পর্যন্ত একজন মুজাহিদও শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ নিজে তার বিশেষ জেনিসারি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সেন্ট রোমানস ফটকের দিকে অগ্রসর হন। তারপর মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্যান্য দলও একের পর এক প্রাচীরে আরোহণ করে। এভাবে কনস্টানটিনোপলের প্রাচীরের ওপর খেলাফতের চন্দ্রখচিত লাল পতাকা ওড়ে।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সব অর্থেই দয়াবান, মানবিক বোধে উজ্জ্বল এবং ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। তার সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের মুসলমান যে শান্তি-সুখে ছিল, অন্য কারও সময়ে তা হয়নি।

পঞ্চায়েতের বিচার নিয়ম

লেখক: মতিউর রহমান শাকিল

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই শিখর গ্রামে। তাই আমাদের মধ্যে গ্রাম সম্পর্কে অনেক মহৎ ধারনা রয়েছে। তবে এদের মধ্যে এমনও অনেকে আছে যারা গ্রাম সম্পর্কে কিছুই জানে না এমনকি জানতেও চায় না। তবে সবাই গ্রামকে একটু বেশি ভালবাসে এবং মনের মধ্যে গ্রামের কিছু বিশেষ ধারণা রাখেন।

আমরা রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ ভালই জানি। তবে আমরা কী এটা কখনও ভেবে দেখেছি যে, রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার পূর্বে আরও একটি বিচার ব্যবস্থা রয়েছে? হয়তো অনেকেই জানেন আবার অনেকেরই এর সম্পর্কে কোনো ধারনা নেই। রাষ্ট্রীয় বিচারের পূর্বে যা হয় তা হলো গ্রাম্য সালিশ বা পঞ্চায়েতের বিচার ব্যবস্থা। যাদের এর সম্পর্কে কিছুটা ধারনা আছে তারা অবশ্যই তাদের মতামত জানাবেন এবং যাদের কোনো ধারণা নেই তারা এই লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়েন। আশা করি নিরাশ হবেন না।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচারের কোনো উল্লেখিত ধাপ থাকে না। তবে কিছু নিয়ম উল্লেখযুগ্য। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো দুই পক্ষকে

মিলিয়ে দেওয়া, রায় অসম্পুর্নভাবে রেখে যাওয়া, ছোটদের কোনো কথা না শুনা ইত্যাদি। মনে করুন, হারুন আর রহিম দুই ভাই। হারুন রহিমের চেয়ে বয়সে বড়। এখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে হারুন এবং রহিমের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হলো। এখন কিছু মানুষ আছে যারা হারুনকে উসকে দেয় এবং এরাই আবার রহিমকে উসকে দেয়। তারপর হারুন এবং রহিমের মধ্যে মুটামুটি একটা তর্কাতর্কি হয় এবং পরে তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যায় এবং সকল ঘটনা তাদের স্ত্রী এবং সন্তানকে জানায়। তারপর হারুন আর রহিম ঘরে বসে থাকে এবং দুই পক্ষের স্ত্রী সন্তানরা মারামারি করে। তারপর এই মারামারি শুনে গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু মানুষ আসে সেটা বন্ধ করার জন্য।

মনে করি এই পঞ্চায়তে সদস্য করিম এবং আকবর। প্রথম ১০ মিনিট এরা নিরবতা পালন করে। তারপর এরা ঝগড়াকে আরও বেগবান করে তুলে। এরা দুইজন মিলে উক্ত দুই পক্ষকে উসকে দেয়। তারপর তারা বিচারের কথা বলে। তারপর হারুন আর রহিমকে তাদের নিজ নিজ ঘর থেকে বের করে পঞ্চায়েতের বিচার মেনে নেওয়ার জন্য রাজি করা হয়। এখন করিম এবং আকবর দুই পক্ষের কাছ থেকে আমানত হিসাবে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা নিয়ে পঞ্চায়েতে জমা করে। পরে কোনো এক সন্ধ্যায় বিচারের সময় নির্ধারন করা হয়।

এখন অনেকেই আমাকে এই বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন করতে পারেন। তবে আমি সত্য একটি ঘটনা উল্লেখ করেছি। বাস্তবে গ্রামের অধিকাংশ ঝগড়া হয় ভাই ভাইয়ের মধ্যে তাও খুব ছোট একটি বিষয় নিয়ে। আর পঞ্চায়েত সদস্যরাও এমনটাই করেন।

এখন আমরা চলে যাই পঞ্চায়েতের বিচার সভায়। সন্ধ্যাবেলা গ্রামের সকল মুরব্বি এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত হন। তারপর শুরু হয় আলাপ। তবে এটা ঐ ঝগড়া সম্পর্কিত কোনো আলাপ না, এমনিতেই যার যা মাথায় আসে তা নিয়েই। এখন অনেকেই আবার বলতে পারের আমি মিথ্যা বলছি। তবে আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নেই, আমি কেবল বাস্ড়বটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যাই হউক, আসল কথায় আসা যাক। তো তারা কিছুক্ষন কথা বলার পর চা বা পান খান। তারপর শুরু হয় ঐ ঝগড়া নিয়ে কথা। তো কথা শুরু করেন করিম এবং আকবর। উনারা গিয়ে কী দেখেছেন সেটাই একটু রঙ

লাগিয়ে বলেন আর সবাই নিরব ভূমিকা পালক করেন। যদি কেউ কিছু বলে ফেলে তাহলে তার মুখ ধমক দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। করিম এবং আকবরের কথা বলা শেষ হয়ে গেলে বিষয়টা আবার বিশ্লেষন করার জন্য হারুনকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। তো হারুন তার অবস্থান থেকে সকল দোষ তার ছোট ভাইয়ের উপর চাপিয়ে কথা শেষ করে।

এখন আপনি কী ভাবছেন? রহিমের কথা শুনা হবে তারপর বিষয়টা ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে সবার মতামত নিয়ে বিচারের রায় প্রদান করা হবে? একদম না। আপনার ভাবনাকে এরা সম্পুর্ন বিপরীত করে তুলবে।

হারুনের মতামতের পরে পঞ্চায়েতের একজন নিজের মন্তব্য রাখবেন। এদিকে রহিম কিছু বলতে চাইলেও তাকে বলার সুযোগ দেওয়া হবে না। কারণ সে হারুনের চেয়ে বয়সে বড়। তাকেও ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা হবে। তারপর ঐ পঞ্চায়েতের সদস্য এক পর্যায়ে বলবেন কারো কিছু বলার থাকলে সেটা বলার জন্য। কিন্তু যদি কেউ কিছু বলতে চায় তাহলে আবার তাকে বলার সুযোগ দিবে না। অবশেষে বলা হবে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মন থেকে সব দূর করে দিতে। শেষ। এই বিচার পরিপূর্ন।

এদিকে রহিমের কোনো কথাই জানা হলো না। কেন? সে বয়সে ছোট, তার কথা বলা অভদ্রতা। আর পরে রইলো দুই পক্ষের ১০ হাজার টাকা। এই টাকা গ্রামের উন্নয়নের জন্য ব্যবহারের কথা বলে ঐ পঞ্চায়েত সদস্যরা গ্রাস করবেন।

এখানে আপনার মতামত কী,
বিচারটা কী আসলেই যুক্তিযুক্ত হলো?
কেউ কী ন্যায় বিচার পেলো?
আসলেই কী হারুন আর রহিম মন থেকে সব দূর করে দিতে পারবে?
রহিম কী মনে কোনো কষ্ট পায়নি?
এখানেই কী সত্যিই সবার মতামতের ভিত্তিতে বিচার করা হয়?

আসলেই গ্রামের মানুষ সহজ সরল। নাহলে এদের অজানার জুলুম কেন মুখ বুজে সহ্য করবে। আপনি সহ্য করবেন?

পউষ এলো গো!
পউষ এলো অশ্র”-পাথার হিম পারাবার পারায়ে
ঐ যে এলো গো-
কুজঝটিকার ঘোম্‌টা-পরা দিগন-রে দাঁডয়ে
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ-হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে।।

পউষ এলো গো-
এক বছরের শ্রানি- পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো! পউষ এলো-
শুক্‌নো নিশাস্‌, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ-হা) ভাঙা গলার সুর-
‘ ওঠে পথিক! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের কর”ণ চাওযয়া ছাড়ায়ে।।’

LEGENDS

WHO WERE BORN IN

OCTOBER

এ কে ফজলুল হক

জন্ম : ২৬/১০/১৮৭৩
মৃত্যু : ২৭/০৪/১৯৬২

তিনি একজন ব্রিটিশ ভারতীয় ও পাকিস্তানি আইনজীবী, লেখক এবং পূর্ব বাংলার সংসদ সদস্য।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

জন্ম : ০৬/১০/১৯৬৬
মৃত্যু : --

একজন বাংলাদেশী রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী স্পিকার।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান

জন্ম : ২৯/১০/১৯৪১
মৃত্যু : ২০/০৮/১৯৭১

বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান বাংলাদেশের একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা।

রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

জন্ম : ১৬/১০/১৯৫৬
মৃত্যু : ২১/০৬/১৯৯১

বাংলাদেশি কবি ও গীতিকার। তার জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে অন্যতম "বাতাসে লাশের গন্ধ"।

তাহসান রহমান খান

জন্ম : ১৮/১০/১৯৭৯
মৃত্যু : --

২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন মার্কেটিং এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন।

মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা

জন্ম : ০৫/১০/১৯৮৩
মৃত্যু : --

একজন বাংলাদেশী ক্রিকেটার, যিনি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক টেস্ট, ওয়ানডেতে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক ছিলেন।

কুইজ

"প্রযুক্তিবিদ্যার" এই মাসিক কুইজ প্রতিযোগিতায় আপনাকে স্বাগতম।

কুইজে অংশগ্রহনকারী বিজয়ীদের জন্য রয়েছে আকর্ষনীয় পুরষ্কার।
যা কুরিয়ারের মাধ্যমে বিজয়ীদের বাসায় পৌছে দেওয়া হবে।

কুইজে অংশ নিতে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন, অথবা Link বাটমে ক্লিক করুন।

SCAN ME

Link

বি:দ্র: বিজয়ীদের তালিকা পরবর্তী মাসের ম্যাগাজিনে উল্লেখে করা হবে।